

প্রো ফেসর শঙ্কুর ডায়রি

৪৬

শঙ্কুর শনির দশা

৪

৭ই জুন
আমাকে দেশবিদেশে অনেকে অনেক সময় জিজ্ঞাসা করেছে আমি
জ্যোতিষে বিশ্বাস করি কিনা। প্রতিবারই আমি প্রশ্নটার একই উত্তর
দিয়েছি—আমি এখনো এমন কোনো জ্যোতিষীর সাক্ষাৎ পাইনি যাঁর কথায় বা
কাজে আমার জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর বিশ্বাস জন্মাবে। কিন্তু আজ থেকে তিন মাস
আগে অবিনাশিবু যে জ্যোতিষীকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসেন, আজ আমি
বলতে পারি যে তাঁর গণনা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে।

অবিশ্য এটাও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে গণনা না-ফললেই বেশি খুশি হতাম।
তিনি বলেছিলেন, ‘আজ থেকে তিন মাস পরে তোমার চরম সংকটের দিন
আসছে। শনির দৃষ্টি পড়বে তোমার উপর। এমনই অবস্থায় পড়বে যে মনে হবে
এর চেয়ে মৃত্যুও ভালো।’ এ অবস্থা থেকে মুক্তি হবে কিনা জিগোস করাতে
বললেন, ‘যে তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু, তাকে সংহার করতে পারলে তবেই
মুক্তি।’ আমি স্বভাবতই জিগোস করলাম এ-শত্রুটি কে। তাতে তিনি ভারী
রহস্যজনকভাবে একটু হেসে বললেন, ‘তুমি নিজে।’

এই রহস্যের কিনারা এখনো হ্যানি, কিন্তু সংকট যেটা এসেছে তার চেয়ে মৃত্যু
যে ভালো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই সংকটের সূত্রপাত আজই পাওয়া
একটি চিঠিতে। দু মাস আগে আমি মাড্রিড থেকে একটা বিজ্ঞানী সম্মেলনে
অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ পাই। এই চিঠিতে সম্মেলনের উদ্বোক্ত
বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণিতত্ত্ববিদ্য ডি-সার্টস লিখেছিলেন, ‘আমরা সকলেই বিশেষ করে
তোমাকে চাই। তুমি না-এলে আমাদের সম্মেলন যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করবে না।
আশা করি তুমি আমাদের হতাশ করবে না।’ এ-চিঠি পাবার তিনদিন পরে আমার
বন্ধু জন সামারভিল ইংল্যান্ড থেকে আমাকে লেখে মাড্রিড যাবার জন্য বিশেষ

অনুরোধ জানিয়ে। ডি-সান্টসকে হতাশ করার কোনো অভিপ্রায় আমার ছিল না। বছরে অস্তত একবার করে বিদেশে গিয়ে নানান দেশের নানান বয়সের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আমার নিজের চিন্তাকে সংজীবিত করা—এটা আমার একটা অভ্যাসের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এর ফলেই বয়স সহেও আমার দেহমন এখনো সজীব।

ম্যাড্রিদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যে চিঠি লিখি, তারও জবাব আমি দু সপ্তাহের মধ্যেই পেয়ে যাই। ১৫ই জুন, অর্থাৎ আজ থেকে আট দিন পরে, আমার রওনা হবার কথা। এই অবস্থায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো আজকের চিঠি। মাত্র তিন লাইনের চিঠি। তার মর্ম হচ্ছে—ম্যাড্রিড বিজ্ঞানী সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ তাঁদের আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করছেন। পরিকার ভাষা। তাঁরা চান না যে আমি এ সম্মেলনে যোগদান করি। কারণ ? কারণ কিছু বলা নেই চিঠিতে।

এ থেকে কী বুঝতে হবে আমায় ? কী এমন ঘটতে পারে যার ফলে এরা আমাকে অপাওক্যের বলে মনে করছেন ?

উত্তর আমার জানা নেই। কোনোদিন জানতে পারব কিনা তাও জানি না। আজ আর লিখতে পারছি না। দেহমন অবসন্ন। আজ এখানেই শেষ করি।

১০ই জুন

আজ সামারভিলের চিঠি পেলাম। সেটা অনুবাদ করলে এই দাঁড়িয়ে—

প্রিয় শঙ্কু,

তুমি দেশে ফিরেছ কিনা জানি না। ইন্সৱুকে গত মাসে তোমার বক্তৃতা সম্পর্কে কাগজে যা বেরিয়েছে সেটা পড়ে আমি দু'বাত ঘুমোতে পারিনি। নিঃসন্দেহে তুমি কোনো কঠিন মানসিক পীড়ায় ভুগছ, না হলে তোমার মুখ দিয়ে এ ধরনের কথা উচ্চারণ হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আমি খবরটা পড়ে ইন্সৱুকে প্রোফেসর স্টাইনারকে ফোন করেছিলাম। তিনি বললেন বক্তৃতার পরে তোমার আর কোনো খবর জানেন না। আশক্তা হয় তুমি ইউরোপেই কোথাও আছ, এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছ। তা যদি না হয়, যদি এ চিঠি তোমার হাতে পড়ে, তাহলে প্রত্যাপ্ত আমাকে টেলিগ্রামে তোমার কুশল সংবাদ জানাবে, এবং সেই সঙ্গে চিঠিতে তোমার এই অভাবনীয় আচরণের কারণ জানাবে। ইতি তোমার

জন সামারভিল

পুনঃ—খবরটা কীভাবে টাইম্স-এ প্রকাশিত হয়েছে সেটা জানাবার জন্য এই কাটিং।

প্রথমেই বলে রাখি যে আমি ইন্সৱুকে গত মাসে কেন, কোনোকালেই যাইনি।

এইবার টাইম্স-এর খবরের কথা বলি। তাতে লিখচে—বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রোঃ টি. শঙ্কু গত ১১ই মে অঙ্গীয়ার ইন্সৱুক শহরে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দেন। সভায় স্থানীয় এবং ইউরোপের অন্যান্য শহরের অনেক বৈজ্ঞানিক উপস্থিতি ছিলেন। প্রোঃ শঙ্কু এইসব বৈজ্ঞানিকদের সরাসরি কৃসিত ভাষায় আক্রমণ করেন। ফলে শ্রোতাদের মধ্যে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, এবং অনেকেই বক্তাকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে মধ্যের দিকে অগ্রসর হন। জনেক শ্রোতা একটি চেয়ার তুলে প্রোঃ শঙ্কুর দিকে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর ইন্সৱুক-নিবাসী পদার্থবিজ্ঞানী ডক্টর কার্ল গ্রোপিয়াস বক্তাকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেন।

এই হল খবর। সামারভিল যেমন চেয়েছিল, আমি তার চিঠি পাওয়ামাত্র জবাব লিখে সে চিঠি নিজে ডাকে ফেলে এসেছি। কিন্তু তাতে আমি কী ফল আশা করতে পারি ? সামারভিল কি আমার কথা বিশ্বাস করবে ? কোনো সুস্থমস্তিক মানুষ কি বিশ্বাস করবে যে আমারই পরিবর্তে অবিকল আমারই মতো দেখতে একজন লোক ইন্সৱুকে গিয়ে এই বক্তৃতা দিয়ে আমার সর্বনাশ করেছে ? সামারভিলের সঙ্গে আমার তেত্রিশ বছরের বন্ধুত্ব ; সে-ই, যদি বিশ্বাস না করেতো কে করবে ? খবরে বলেছে যে ডক্টর গ্রোপিয়াস আমাকে—অর্থাৎ এই রহস্যজনক দ্বিতীয় শঙ্কুকে—বাঁচান। গ্রোপিয়াসকে আমি চিনি। সাত বছর আগে বাগদাদে আন্তর্জাতিক আবিক্ষারক সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হল। স্বল্পভাষ্য আয়িক ব্যক্তি বলে মনে হয়েছিল। সামারভিলের সঙ্গে তাঁকেও একটা চিঠি লিখে দিয়েছি।

নিজেকে এত অসহায় আর কখনো মনে হয়নি। আশক্তা হচ্ছে বাকি জীবনটা এই বিশ্বী কলক্ষের বোঝা কাঁধে নিয়ে গিরিডি শহরে দাগী আসামির মতো কাটাতে হবে।

২১শে জুন

গ্রোপিয়াসের চিঠি—এবং অত্যন্ত জরুরী চিঠি। আজই ইন্সৱুক যাবার বদোবস্ত করতে হবে।

টাইম্স-এর বিবরণ যে অতিরিক্ত নয় সেটা গ্রোপিয়াসের চিঠিতে বুলাম। কুমানিয়ার মাইক্রো-বায়োলজিস্ট জর্জ পোপেস্কু নাকি আমার দিকে চেয়ার ছুঁড়ে মারেন। এনজাইম সম্পর্কে তাঁর মহামূল্য গবেষণাকে আমি নাকি অবচিন বলে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই তিনি প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত

হয়ে পড়েন। গ্রোপিয়াস মধ্যে আমার পাশেই বসে ছিল ; সে আমার হাত ধরে
হাঁচাকা টান মেরে এক পাশে সরিয়ে আমার প্রাণ বাঁচায়। চেয়ারটা একটা
মাইক্রোফোনকে বিকল করে দিয়ে টেবিলের উপর রাখা জল ভর্তি দুটো কাঁচের
গোলাসকে চুরমার করে দেয়। গ্রোপিয়াস লিখছে—

‘তোমাকে আমি হাত ধরে টেনে স্টান লাইব্ৰেণ্ডস হলের বাইরে নিয়ে আস। তুমি তখন এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলে যে তোমাকে ধরে রাখা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। বাইরে আমার গাড়ি অপেক্ষা করছিল ; কোনোৱকমে তাতে তোমাকে তুলে আমি রওনা দিই। হাত ধৰেই বুৰেছিলাম যে তোমার গা জুৱে পুড়ে যাচ্ছে। ইচ্ছা ছিল হাসপাতালে নিয়ে যাব, কিন্তু এক কিলোমিটাৰ গিয়ে একটা চৌমাথায় ট্র্যাফিক লাইটের দুরুন গাড়িটা থামার সঙ্গে সঙ্গে তুমি দৰজা খুলে নেমে পালাও। তাৱপৰ অনেক খুজেও আৱ তোমার দেখা পাইনি। তোমার চিঠি পেয়ে বুৰলাম তুমি দেশে ফিরে গৈছ। বিদেশী বৈজ্ঞানিক মহলে তোমার নামে যে কলক রটেছে সেটা কীভাৱে দূৰ হবে জানি না, তবে তুমি যদি একবাৰ ইন্সৱুকে আসতে পাৱ, তাহলে ভালো ভাঙ্গাৱেৰ সকান দিতে পাৱি। তোমাকে পৰীক্ষা কৰে যদি কোনো মস্তিষ্ক বা ম্যায়ুৰ গণগোল ধৰা পড়ে, তাহলে সেদিনকাৰ ঘটনাৰ একটা স্পষ্ট কাৰণ পাওয়া যাবে, এবং সেটা তোমার পক্ষে সুবিধাজনক হবে। অসুখ যদি হয়েই থাকে তাহলে তাৱ চিকিৎসাৰ কোনো ত্ৰুটি হবে না ইন্সৱুকে।’

গ্রোপিয়াস ইন্সব্রুকের একটা কাগজ থেকে সেদিনকার ঘটনার একটা ছবিও পাঠিয়ে দিয়েছে। হস্তদস্ত গ্রোপিয়াস ‘আমার’ পিঠে হাত দিয়ে ‘আমাকে’ একপাশে সরিয়ে দিচ্ছেন। এই ‘আমি’-র সঙ্গে আমার চেহারার কোনো পার্থক্য ছবিতে ধরতে পারলাম না। কেবল আমার চশমাটা—যেটা ছবিতে দেখছি প্রায় খুলে এসেছে—সেটার কাঁচ স্বচ্ছ না হয়ে ঘোলাটে বলে মনে হচ্ছে। ‘আমার’ ডাইনে বায়ে টেবিলের পিছনে বসা ব্যক্তিদের মধ্যে আরো দুজনকে চেনা যাচ্ছে; একজন হলেন রুশ বৈজ্ঞানিক ডেষ্ট্র বোরোভিন, আর অন্যজন ইন্সব্রুকেরই তরুণ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রোফেসর ফিংকেলস্টাইন। ফিংকেলস্টাইন তার হাত দুটো আমার দিকে বাড়িয়ে রয়েছে। হয়ত সেও আমাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল !

আজ সারাদিন ধরে গভীরভাবে চিন্তা করে বুঝেছি যে আমাকে ইন্সুলুক মেতেই হবে। সেই জ্যোতিষীর কথা মনে পড়ছে। সে বলেছিল আমার এই প্রম শত্রুটিকে সংহার না করলে আমার মৃত্যি নেই। আমার মন বলছে এই ব্যক্তি এখনো ইন্সুলুকেই রয়েছে আঘাগোপন করে। তার সন্ধানই হবে এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য।

সামারভিলকে লিখে দিয়েছি আমার সংকল্পের কথা। দেখা যাক কী হয়।

২৩শে জুন

আজ নতুন করে আমার মনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে

আমার ডায়ারি খুলে গত তিনি মাসের দিনলিপি পড়ে দেখছিলাম। মে মাসের তেসরো থেকে বাইশে পর্যন্ত দেখলাম কোনো এন্ট্রি নেই। সেটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ উল্লেখযোগ্য কিছু না ঘটলে আমি ডায়ারি লিখি না। কিন্তু খট্কা লাগছে এই কারণে যে ওই সময়টাতেই ইন্সব্রুকের ঘটনাটা ঘটেছিল। এমন যদি হয় যে আমি ইন্সব্রুকের নেমস্টন পেয়েছিলাম, ইন্সব্রুকে গিয়েছিলাম, ওই রকম বড়তাই দিয়েছিলাম, এবং তারপর ইন্সব্রুক থেকে ফিরে এসেছিলাম—কিন্তু এই পুরো ঘটনাটাই আমার মন থেকে লোপ পেয়ে গেছে? কোনো সাময়িক মন্তিকের ব্যারাম থেকে কি এ-ধরনের বিশ্বৃতি সম্ভব? এটা অবিশ্ব খুব সহজেই যাচাই করা যেত; দুঃখের বিষয় যে-দুটি ব্যক্তির সঙ্গে গিরিডিতে আমার প্রতিদিনই দেখা হয়, তাদের একজনও ওই সময়টা এখানে ছিলেন না। আমার চাকর প্রয়োদ গত দু মাস হল ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। যাকে বদলি দিয়ে গেছে, সেই ছেদিলালকে জিগোস করেছিলাম। বললাম, ‘গত মাসে আমি গিরিডি ছেড়ে কোথাও গিয়েছিলাম কিনা তোমার মনে আছে?’ সে চোখ কপালে তুলে বলল, ‘আপনার স্মরণে থাকবে না তো হামার থাকবে কেইসম বাবু?’ আমারই ভুল হয়েছে; এ জিনিস কাউকে জিগোস করা যায় না। একজনকে জিগোস করা যেত; আমার বন্ধু অবিনাশবাবু। কিন্তু তিনি গত শুক্রবার চাইবাসা চলে গেছেন তাঁর ভাগনীর বিয়েতে।

ইন্সুলুকের কোনো চিঠি আমার ফাইলের মধ্যে পাইনি। আশা করি আমার
আশঙ্কা অমর্লক।

আমি ডেট জলাই ইনসুব্রক রওনা হচ্ছি। কপালে কী আছে কে জানে।

১৩ জলান্তি

ইন্সুরুক। বিকেল চারটে। ভিয়েনা থেকে ট্রেন ধরে সকাল দশটায় পৌছেছি এখানে। ছবি সমেত নকল-শঙ্কুর বক্তৃতা এখানকার কাগজে বেরোনোর যে কী ফল হয়েছে সেটা শহরে পদার্পণ করেই বুঝেছি। পরপর তিনটে হোটেলে আমাকে জায়গা দেয়নি। তৃতীয় হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা টাঙ্গিতে উঠতে গিয়েছিলাম, ড্রাইভার মাথা নেড়ে না করে দিল। শেষটায় হাতে বাগ নিয়ে প্রায় পঁয়তাঙ্গিশ মিনিট ইঠে একটা গলির ভিতর ছোট একটা সরাইখানা গোছের হোটেলে ঘর পেলাম। মালিকের পুরু চশমা দেখে মনে হল সে ভালো চোখে দেখে না, আমার বিশ্বাস সেই কারণেই আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি হল না। কিন্তু এভাবে গা ঢাকা দিয়ে থেকে কাজের বেশ অসুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে।

আজ ব্রাত্রে সামারভিল আসছে। তাকে গিরিডি থেকেই ইন্সুলুকে যাওয়া বলে

লিখেছিলাম, এবং এখানে এসেই টেলিফোন করেছি। তার জরুরী কাজ ছিল, তাও সে আসবে বলে কথা দিয়েছে।

গ্রোপিয়াসকে ফোন করেছিলাম। তার সঙ্গে আজ সাড়ে পাঁচটায় আপয়েটমেন্ট। সে থাকে এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে। বলেছে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে।

আরো একজনকে ফোন করা হয়ে গেছে এর মধ্যে: প্রোফেসর ফিংকেলস্টাইন। শুধু একজনের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনলে চলবে না, তাই ফিংকেলস্টাইনের সঙ্গে কথা বলা দরকার। ভদ্রলোক বাড়ি ছিলেন না। চাকর ফোন ধরেছিল। আমার নম্বর দিয়ে দিয়েছি, বলেছি এসেই যেন ফোন করেন।

পাহাড়ে যেরা অতি সুন্দর শহর ইন্সুরুক। যুক্তের সময় অনেক কিছুই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এখন আবার সব নতুন করে গড়েছে। অবিশ্বিশ্ব শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো মনের অবস্থা আমার নেই। আমার এখন একমাত্র লক্ষ্য হল সেই জ্যোতিষীর গণনায় নির্ভর করে আমার মুক্তির পথ খৈঁজা।

৭ই জুলাই, রাত সাড়ে দশটা
গ্রোপিয়াসের সঙ্গে সাক্ষাত্কারের ঘটনাটা গুছিয়ে লিখতে চেষ্টা করছি।

পাঁচটার কিছু আগেই আমার এই আপোলো হোটেলের একটি ছোক্রা এসে খবর দিল হেব প্রোফেসর শানকোর জন্য গাড়ি পাঠিয়েছেন হেব ডক্টর গ্রোপিয়াস। গাড়ির চেহারা দেখে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলাম। এককালে—অর্থাৎ অন্তত ত্রিশ বছর আগে—এটা হয়ত বেশ বাহারের গাড়ি ছিল, কিন্তু এখন রীতিমত জীৰ্ণদস্য। গ্রোপিয়াস কি দরিদ্র, না কপণ?

পাঁচটার মধ্যেই প্রেমেওয়াল্টস্টাসে পৌঁছে গেলাম। এই রাত্তাতেই গ্রোপিয়াসের বাড়ি। একটা প্রাচীন গির্জা ও গোরস্থান পেরিয়ে গাড়িটা বায়ে একটা গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে গেল। বাড়িটাও দেখলাম গাড়িরই মতো। গেট থেকে সদর দরজা পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে বাগান আগাছায় ভরে আছে, অর্থাৎ আসবার পথে অন্যান্য বাড়ির সামনের বাগানে ফুলের প্রাচুর্য দেখে চোখ জুড়িয়ে গেছে।

বাগানাদে গ্রোপিয়াসের চেহারা যা মনে ছিল, তার তুলনায় এবারে তাকে অনেক বেশি বিদ্রুল বলে মনে হল। সাত বছরে এত বেশি বুড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। হয়ত কোনো পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটে থাকবে। আমি এ ব্যাপারে কোনো অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করলাম না, কারণ তার নিজের স্বাস্থ্যের চেয়ে আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন বলে মনে হল।

বৈঠকখানায় দুজনে মুখোমুখি বসার পর গ্রোপিয়াস বেশ মিনিট দুয়েক ধরে

আমাকে পর্যবেক্ষণ করল। শেষটায় আমাকে বাধা হয়েই হালকাভাবে জিগোস করতে হল, ‘আমিই সেই শঙ্কু কিনা সেটা ঠাহর করতে চেষ্টা করছ? ’

গ্রোপিয়াস আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে যে-কথাটা বলল তাতে আমার ভাবনা দিগ্ন বেড়ে গেল।

‘ডক্টর ওয়েবার আসছেন। তিনি তোমাকে পরীক্ষা করে দেখবেন। সেদিন তোমাকে ওয়েবারের ক্লিনিকেই নিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তুমি সে সুযোগ দাওনি। আশা করি এবারে তুমি আপত্তি করবে না। একমাত্র আমিই বিশ্বাস করি যে সেদিন তুমি অসুস্থ ছিলে বলেই এসব কথা বলতে পেরেছিলে। অন্য যারা ছিল তারা আমার সঙ্গে একমত নয়। তারা এখনো পেলে তোমাকে ছিড়ে থাবে। কিন্তু ওয়েবারের পরীক্ষার ফলে যদি প্রমাণ হয় যে তোমার মাথায় গোলমাল হয়েছে, তাহলে হয়ত এরা তোমাকে ক্ষমা করবে। শুধু তাই নয়; চিকিৎসার সাহায্যে সুস্থ হয়ে তুমি হয়ত আবার তোমার সুনাম ফিরে পাবে। ’

আমি অগত্যা বলতে বাধা হলাম যে গত চল্লিশ বছরে একদিনের জন্যেও আমি অসুস্থ হইনি। দেহিক, মানসিক, কোনো ব্যাধির সঙ্গেই আমার পরিচয় নেই।

গ্রোপিয়াস বলল, ‘তাহলে কি তুমি বলতে চাও যে এত সব নামকরা বৈজ্ঞানিক—শিমানোফ্রিকি, রিটার, পোপেস্কু, আলটমান, স্ট্রাইথার, এমনকি আমি নিজে—এদের সম্বন্ধে তুমি এত নীচ ধারণা পোষণ কর?’

আমি যথাসম্ভব শাস্ত্রভাবে বললাম, ‘গ্রোপিয়াস, আমি বিশ্বাস করি যে আমারই মতো দেখতে আরেকজন লোক রয়েছে, যে নিজে বা অন্য কোনো লোকের প্ররোচনায় আমাকে অপদৃষ্ট করার জন্য এইসব করছে। ’

‘তাহলে সে লোক এখন কোথায়? সেদিন আমার গাড়ি থেকে নেমে সে শহর থেকে কি ভ্যানিশ করে গেল? তোমার না হয় পাসপোর্ট ছিল, টিকিট ছিল, তুমি সোজা প্লেন ধরে দেশে ফিরে গেছ, কিন্তু একজন প্রতারকের পক্ষে তোহাঠাঁশ শহর থেকে পালানো এত সহজ নয়। ’

আমি বললাম, ‘আমার বিশ্বাস সে লোক এই শহরেই আছে। এমনও হতে পারে যে সে একজন অখ্যাত বৈজ্ঞানিক, অনেক জয়গায় আমাকে দেখেছে, আমার বক্তৃতা শুনেছে। বোঝাই যাচ্ছে আমার সঙ্গে তার কিছুটা সাদৃশ্য আছে, বাকিটা সে মেক-আপের সাহায্যে পুরিয়ে নিয়েছে। ’

গ্রোপিয়াসের চাব-র হট চকোলেট দিয়ে গেল। চাকরের সঙ্গে সঙ্গে একটা কুকুরও এসে ঘরে ঢুকেছে, বুঝালাম সেটা জাতে ডোবারমান পিন্শার। কুকুরটা আমাকে দেখে লেজ নাড়তে নাড়তে কাছে এসে আমার প্যাট শুক্তে লাগল। কিন্তু তার পরেই দেখলাম সে আমার মুখের দিকে চেয়ে বার তিনেক গুরু গুরু



শব্দ করল। গ্রোপিয়াস ‘ফ্রিকা, ফ্রিকা’ বলে দুবার ধমক দিতেই সে যেন বিরক্ত হয়ে আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে কিছু দূরে কার্পেটের উপর বসে পড়ল।

‘তুমি এখানে এসেছ বলে আর কেউ জানে কি?’ গ্রোপিয়াস প্রশ্ন করল।

আমি বললাম, ‘ইন্সৱুকে আমার জানা বলতে আর একজনই আছেন। তাঁকে এসে ফোন করেছিলাম, কিন্তু তিনি বাড়ি ছিলেন না। তাঁর চাকরকে আমার ফোন নম্বর দিয়ে দিয়েছি।’

‘কে তিনি?’

আমি একটু হেসে বললাম, ‘তিনিও প্রোফেসর শঙ্কুর বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। তোমার পাঠানো খবরের কাগজের ছবিতে তাঁকে দেখলাম।’

গ্রোপিয়াস ভুক্তিত করল।

‘কার কথা বলছ তুমি?’

‘প্রোফেসর ফিংকেলস্টাইন।’

‘আই সী।’

খবরটা শুনে গ্রোপিয়াসকে তেমন প্রসম বলে মনে হল না। প্রায় আধ মিনিট চুপ থাকার পর আমার দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, ‘ফিংকেলস্টাইনের গবেষণা সম্বন্ধে সেদিন তুমি কী বলেছিলে সেটা মনে আছে?’

আমি বাধা হয়েই মাথা নেড়ে না বললাম।

‘যদি মনে থাকত তাহলে আর তাকে ফোন করতে না। তুমি বলেছিলে একটি তিন বছরের শিশুও তার চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে।’

আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। খুব ভালো করেই জানি এই উন্মাদ বক্তৃতার জন্য আমি দায়ী নই, কিন্তু এখানকার লোকের যদি সত্যিই ধারণা হয়ে থাকে যে এই প্রত্যাকই হচ্ছে আসল শঙ্কু, তাহলে আমার বিপদের শেষ নেই। গ্রোপিয়াস ছাড়া কি তাহলে আমি কারূর উপরেই ভরসা রাখতে পারব না?

একটা গাড়ির শব্দ।

‘ওই বোধহয় ওয়েবার এল,’ বলল গ্রোপিয়াস।

ডাক্তারকে আমার ভালো লাগল না। জামানির তুলনায় অস্ত্রিয়ার লোকদের মধ্যে যে মোলায়েম ভাব থাকে, সেটা এর মধ্যেও আছে, তবে সেটার মাঝাটা যেন একটু অশ্঵স্তিকর রকম বেশি। মুখে লেগে থাকা সরল হাসিটাও কেন জানি কৃত্রিম বলে মনে হয়।

ওয়েবার আধ ঘটা ধরে আমাকে নানারকম প্রশ্ন করে পরীক্ষা করল, আমিও সব সহ্য করলাম। যাবার সময় বলল, ‘গ্রোপিয়াস তোমাকে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে, কাল সকালে গটফাইটস্ট্রাসেতে আমার ক্লিনিকে এস, সেখানে আমার যন্ত্রপাতি আছে। তোমাকে সুষ্ঠ করাটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে রইল।’

আমি মনে মনে বললাম—তোমার চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি সুষ্ঠ আমি। তুমি এক মাস নথ কাটনি, তোমার ঠোঁটে সিগারেটের কাগজ লেগে আছে, তোমার জিভের দোষে কথা জড়িয়ে যায়—তুমি করবে আমার মাথার ব্যামোর চিকিৎসা?

ওয়েবারকে গাড়িতে তুলে দিতে গ্রোপিয়াস ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, ওর দেরি দেখে আমি ঘরটা ঘুরে দেখছিলাম, তাকের উপর ফোটো অ্যালবাম দেখে

পাতা উলটে দেখি একটা ছবিতে আমি রয়েছি। এ ছবি আমার কাছে নেই, তবে এটা তোলার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। বাগদাদের হোটেল স্প্লেন্ডিডের সামনে তোলা। আমি, গ্রোপিয়াস আর রুশ বৈজ্ঞানিক কামেন্স্কি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি।

‘তোমার সঙ্গে জিনিসপত্র কী আছে?’ গ্রোপিয়াস ঘরে ফিরে এসে প্রশ্ন করল।

‘কেন বল তো?’

‘আমার মনে হয় তুমি আমার এখানে চলে এস। তোমার নিরাপত্তার জন্যই আমি এই প্রস্তাব করছি। আমার বড় গেস্টরুম আছে, তুমি এর আগেও সেখানে থেকে গেছ—যদিও তোমার সেটা মনে থাকার কথা নয়। মে মাসে যখন এসেছিলে তখন তুমি আমারই আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলে।’

ব্যাপারটা অসম্ভব জানলেও মাথাটা কেমন জানি শুলিয়ে উঠছিল। আমি জিগ্যেস করলাম, ‘আমাকে কি তুমই নেমন্তন্ত্র করেছিলে?’

গ্রোপিয়াস এর উত্তরে উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে একটা ফাইল নিয়ে এল। তাতে অন্য চিঠির মধ্যে আমার দুখানা চিঠি রয়েছে। অবিকল আমার চিঠির কাগজ, আমার সই, আমার অলিভেটি টাইপরাইটারের হরফ। প্রথম চিঠিটায় লিখেছি যে মে মাসে এমনিতেই আমি ইউরোপ যাচ্ছি, কাজেই ইন্সুরুকে যাওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই। দ্বিতীয় চিঠিটায় জানিয়েছি কবে পৌঁছাচ্ছি।

রহস্য ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে এবং সেই সঙ্গে আমার সংকটাপন অবস্থাটাও ক্রমশ: স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এখানের হোটেলেই যখন আমাকে চুক্তে দেয়নি, তখন যে-লোককে আমি প্রাক্ষণ্য বক্তৃতায় নাম ধরে অপমান করেছি, আমার প্রতি তার মনোভাব কী হবে সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

কিন্তু গ্রোপিয়াসকে বলতে হল যে এখুনি তার বাড়িতে এসে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব না।

‘আজ রাত্রে আমার বন্ধু সামারভিল লন্ডন থেকে আসছে। কাল যদি আমরা দুজনে একসঙ্গে তোমার বাড়িতে এসে উঠি?’

‘সামারভিল কে?’ একটু সন্দিভিতাবে প্রশ্ন করল গ্রোপিয়াস। আমি সামারভিলের পরিচয় দিয়ে বললাম, ‘সে আমার বিশিষ্ট বন্ধু; ঘটনাটা শুনে সে বিশেষ চিন্তিত।’

‘তোমার কি ধারণা এখানে এসে তোমাকে দেখলে তার চিন্তা দূর হবে?’

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে গ্রোপিয়াসের দিকে চেয়ে রইলাম। আমি জানি ও কী বলবে, এবং ঠিক তাই বলল।

‘তোমার বন্ধুও তোমার চিকিৎসার জন্য আমারই মতো ব্যস্ত হয়ে উঠে এতে কোনো সন্দেহ নেই।’

আমি হোটেলে ফিরেছি সন্ধ্যা সাতটায়। ফিংকেলস্টাইনের কাছ থেকে কোনো ফোন আসেনি। ঘরে গিয়ে চেয়ারে বসে আজকের আশ্চর্য ঘটনাগুলো নিয়ে চিন্তা করছি এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। সামারভিল। রেলস্টেশন থেকে ফোন করছে। বললাম, ‘কী হল, তুমি আসছ না?’

‘আসছি তো বটেই, একটা উৎকণ্ঠা হচ্ছিল তাই ফোনটা করলাম।’

‘কী ব্যাপার?’

‘তুমি অক্ষত আছ কিনা সেটা জানা দরকার।’

‘অক্ষত এবং সম্পূর্ণ সুস্থ।’

‘ভেরি গুড। আমি আধ ঘটার মধ্যে আসছি। অনেক খবর আছে।’

আমার সম্বন্ধে সামারভিল যে কতটা উদ্বিগ্ন সেটা এই টেলিফোনেই বুঝতে পারলাম। কিন্তু কী খবর আনছে সে?

আমার ঘরে যদিও দুটো খাট রয়েছে, কিন্তু ঘরটা এত ছোট যে আমি সামারভিলের জন্য পাশের ঘরটা বদ্দোবন্ধ করব বলে ঠিক করেছিলাম। যখন বাড়ি ফিরেছি তখনও ঘরটা খালি ছিল। হোটেলের মালিককে সেটা সম্বন্ধে বলব বলে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি সে-ঘরে বাতি জ্বলছে এবং আধ-খোলা দরজা দিয়ে কড়া চুরুটের গন্ধ আসছে। আর কোনো খালি ঘর আছে কি? খৌজ নিয়ে জানলাম নেই। অগত্যা আমার এই ছোট ঘরেই সামারভিলকে থাকতে হবে।

আধ ঘটার মধ্যেই সামারভিল এসে পড়ল। ইতিমধ্যে কখন যে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, সেটা খেয়াল করিন; সেটা বুবলাম সামারভিলকে ভিজে বষাণি খুলতে দেখে। বলল, ‘আগে কফি আনাও, তারপর কথা হবে।’

কথাটা বলে সেও গ্রোপিয়াসের মতো মিনিটখানেক ধরে আমার দিকে চেয়ে রইল। এ ব্যাপারটা প্রায় আমার গা-সওয়া হয়ে যাচ্ছে, যদিও সামারভিলের প্রতিক্রিয়া হল অন্যরকম।

‘তোমার চাহনিতে কোনো পরিবর্তন দেখছি না শঙ্কু। আমার বিশ্বাস তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ।’

আমি এতদিনে নিশ্চিপ্তির হাঁপ ছাড়লাম।

কফি আসার পর সামারভিলকে আজকের সারাদিনের ঘটনা বললাম। সব শুনে সে বলল, ‘আমি গত কদিনে পুরানো জামান বৈজ্ঞানিক পত্রিকা হেঁটে গ্রোপিয়াসের কয়েকটা প্রবন্ধ আবিক্ষা করেছি। গত দশ বছরের মধ্যে সে কোনো লেখা লেখেন, কিন্তু তার আগে লিখেছে।’

‘কী সম্বন্ধে লিখেছে?’

‘তার ব্যর্থতা সম্বন্ধে।’

‘কীরকম? কিসের ব্যর্থতা?’

এর উত্তরে সামারভিল যা বলল তাতে যে আমি শুধু অবাকই হলাম তা নয়;

এর ফলে সমস্ত ঘটনাটা একটা নতুন চেহারা নিয়ে উপস্থিত হল আমার সামনে।

সে বলল—

‘তোমার তৈরি অমনিক্ষেপ, তোমার ধৃষ্টির ওয়ুধ মিৱাকিউলল, তোমার লিঙ্গুয়াগ্রাফ, তোমার এয়ারকল্ডিশনিং পিল—প্রত্যেকটি জিনিসই গ্ৰোপিয়াসের মাথা থেকে বেরিয়েছিল। দুঃখের বিষয় প্রতিবারই সে জেনেছে যে তার ঠিক আগেই তুমি এগুলোর পেটেন্ট নিয়ে বসে আছ। অৰ্থাৎ প্রতিভার দৌড়ে আগেই তুমি এগুলোর পেটেন্ট নিয়ে বসে আছ। দশ বছর আগে তার প্রতিবারই সে তোমার কাছে অল্পের জন্য হার মেনেছে। দশ বছর আগে তার শেষ প্রবন্ধে সে অত্যন্ত আক্ষেপ করে বলেছে যে কোনো বৈজ্ঞানিক আবিক্ষারের জন্য খ্যাতিলাভের ব্যাপারটা নেহাতই আকস্মিক। প্রাচীন পুথিপত্র যেঁটে ও এর জন্য খ্যাতিলাভের ব্যাপারটা নেহাতই আকস্মিক। প্রাচীন পুথিপত্র যেঁটে ও এর জন্য নজিরও দেখিয়েছে—যেমন মাধ্যাকৰ্ষণের ব্যাপারে খ্যাতি হল নিউটনের, কিন্তু তারও ত্রিশ বছর আগে ইতালির বৈজ্ঞানিক ফ্রাতেলি নাকি এই মাধ্যাকৰ্ষণের কথা লিখে গেছেন।’

আমি বললাম, ‘ঠিক সেইভাবে বেতারের আবিক্ষারের কৃতিত্ব আমাদের জগদীশ বোসের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন মাৰ্কনি।’

‘এগজাক্টিলি,’ বলল সামারভিল। ‘কাজেই গ্ৰোপিয়াস যদি তোমার প্রতি বিৱৰণভাৱ পোষণ করে তাহলে আশৰ্য হয়ো না।’

‘তাতো বুৰুলাম, কিন্তু এতে দ্বিতীয় শঙ্কুৰ রহস্যের সমাধান হচ্ছে কীভাবে?’

প্ৰশ্না কৰাতে সামারভিল গভীৰ হয়ে গেল। বলল, ‘তোমার সঙ্গে গ্ৰোপিয়াসের শেষ দেখা হয়েছিল বাগদাদে সাত বছর আগে। তাৰপৰ থেকে সে আৱ কোনো বিজ্ঞানী সম্মেলনে যায়নি। এই প্ৰথম গত মে মাসে ইন্সৱুকে তাৰই উদ্যোগে আয়োজিত বিজ্ঞানী সম্মেলনে সে যোগদান কৰে। আৱ—’

আমি সামারভিলকে বাধা দিয়ে বললাম, ‘কিন্তু এই সম্মেলন থেকে আমি কোনো চিঠি পাইনি।’

‘সে তো পাৰেই না। কিন্তু গ্ৰোপিয়াস নিশ্চয়ই বলেছে যে সে তোমাকে ডেকেছে। এমনকি সে তোমার সই সমেত চিঠিও নিশ্চয়ই তাৰ ফাইলে রেখেছে।’

আমাকে বলতেই হল যে সে-চিঠি আমি নিজেৰ চোখে দেখে এসেছি।

‘তাৰ সঙ্গে এৱ আগে তোমার চিঠি লেখালেখি হয়েছে?’ সামারভিল প্ৰশ্ন কৰল।

আমি বললাম, ‘বাগদাদে ওৱ সঙ্গে আলাপ হবাৰ পৰ আমি ওকে দুবাৰ চিঠি লিখেছি, আৱ পৰ পৰ পাঁচ বছৰ নববৰ্ষেৰ সন্তানৰ জানিয়ে কাৰ্ড পাঠিয়োছি।’

সামারভিল গভীৰভাৱে মাথা নাড়ল। তাৰপৰ বলল, ‘তোমাৰ সঙ্গে চেহারাৰ মিল আছে এমন কোনো লোক নিশ্চয়ই জোগাড় কৰেছে গ্ৰোপিয়াস। যেটুকু তফাত সেটুকু মেকআপেৰ সাহায্যে ম্যানেজ কৰেছে, আৱ বক্তৃতাৰ বিষয়টা তাকে আগে থেকেই শিখিয়ে নিয়েছে। টাকাৰ লোভে এ-কাজটা অনেকেই কৰতে রাজি হবে। এই দ্বিতীয় শঙ্কুৰ তো কোনো দায়-দায়িত্ব নেই; সে ফৰমাশ খেটে টাকা পেয়ে খালাস, এদিকে আসল শঙ্কুৰ যা সৰ্বনাশ হবাৰ তা হয়েই গেল, আৱ গ্ৰোপিয়াসেৰও প্ৰতিশোধ নেওয়া হয়ে গেল। ভালো কথা, তোমাৰ বক্তৃতাৰ কোনো রেকৰ্ডিং গ্ৰোপিয়াসেৰ কাছে থাকতে পাৱে?’

প্ৰশ্নটা শুনেই আমাৰ মনে পড়ে গেল বাগদাদে গ্ৰোপিয়াসকে একটা ছেট্টা টেপৱেকৰ্ডাৰ সঙ্গে নিয়ে ঘূৰতে দেখেছি। আমি বললাম, ‘সেটা খুবই সন্তুষ। শুধু তাই না, আমাৰ একটা ভাল রঙিন ছবিও তাৰ কাছে আছে। আমি আজই দেখেছি।’

সামারভিল একটা আক্ষেপসূচক শব্দ কৰে বলল, ‘মুশকিলটা কী জান? যাকে শঙ্কু সাজিয়েছে তাকে খুঁজে পাওয়াৰ সম্ভাবনা খুবই কম। অৰ্থাৎ গ্ৰোপিয়াসেৰ শয়তানি প্ৰমাণ কৰতে গোলে এই দ্বিতীয় শঙ্কুৰ প্ৰয়োজন।’

এই হোটেলে ঘৰে টেলিফোন নেই। দোতলাৰ তিনজন বাসিন্দাৰ জন্য একটিমাত্ৰ টেলিফোন বয়েছে প্যাসেজে। যদি এক নম্বৰেৰ জন্য ফোন আসে তাহলে একবাৰ একবাৰ কৰে রিঙ হতে থাকে, দুই নম্বৰ হলে ডবল রিং, আৱ তিন হলে তিনবাৰ। টেলিফোন দুই দুই কৰে বাজছে দেখে বুঝলাম আমাৰই ফোন।

দৱজা খুলে বাইৱে বেৱিয়ে ফোন ধৰলাম।

‘হ্যালো!

‘প্ৰোফেসৱ শঙ্কু কথা বলছেন?’

‘হাঁ।

‘আমাৰ নাম ফিংকেলস্টাইন।’

আমি বৃথা বাক্যব্যয় না কৰে আসল প্ৰসঙ্গে চলে গেলাম।

‘গত মে মাসে এখানে একটা বিজ্ঞানী সভায় তুমি বোধহয় উপস্থিত ছিলে। কাগজে তোমাৰ ছবি দেখলাম।’

‘তুমি কি তোমাৰ চশমা হাৰিয়েছ?’

এই অপ্রত্যাশিত প্ৰশ্নেৰ কী জবাৰ দিতে হবে ভাৰছি, সেই ফাঁকে ফিংকেলস্টাইন আৱেকটা প্ৰশ্ন কৰে বসল।

‘তোমার চশমার কাঁচ কি ঘোলাটে, না স্বচ্ছ?’

আমি বললাম, ‘স্বচ্ছ। এবং সে চশমা আমার কাছেই আছে, কোনোদিন হারায়নি।’

‘আমার তাই বিশ্বাস। যাই হোক, বিজ্ঞান-সভায় যে-শঙ্কু বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তিনি ঘর থেকে বেরোবার সময় তাঁর চশমাটা খুলে মেরুতে পড়ে যায়। সেটা আমি তুলে নিই। শুধু চশমা নয়, তার সঙ্গে একটি জিনিস আটকে ছিল, সেটাও আমার কাছে আছে।’

‘কী জিনিস?’

‘সেটা তুমি এলে দেখাব। ওটা না পেলে কিন্তু আমারও ধারণা হত যে যিনি বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি আসল শঙ্কু, নকল নন।’

কথাটা শুনে আমার হৃৎক্ষম্প শুরু হয়ে গেছে। বললাম, ‘কখন তোমার সঙ্গে দেখ করা যায়?’

ফিংকেলস্টাইন বলল, ‘এখন রাত হয়ে গেছে, আর দিনটাও ভালো না। কাল সকাল সাড়ে আটটায় আমার বাড়িতে এসো। বেশি সকাল হয়ে যাচ্ছে না তো?’

‘না, না। ঠিক সাড়ে আটটায় যাবো। আমার সঙ্গে আমার ইংরেজ বন্ধু জন সামারভিলও থাকবে।’

‘বেশ, তাকে নিয়ে এস। তখনই কথা হবে। অনেক কিছু বলার আছে।’

ফোন রেখে দিলাম। সামারভিল পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। দুজনে আবার ঘরে ফিরে এলাম। সামারভিল দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, ‘তিনি নম্বরে যে আছে তাকে চেনো?’

‘কেন বল তো? লোকটি আজ সন্ধ্যায় এসেছে।’

‘ভদ্রলোকের একটু বেশিরকম কৌতুহল বলে মনে হল। চুক্টের গন্ধ পেয়ে পিছনে ফিরে দেখি দরজাটা এক ইঁধিং ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার ফোনের কথা শোনার তার এত আগ্রহ কেন?’

‘এর উপর আমি জানি না। লোকটা কে তাও জানি না। আশা করি কাল ফিংকেলস্টাইনের সঙ্গে কথা বললে রহস্য অনেকটা পরিষ্কার হবে।

এখন রাত এগারোটা বৃষ্টি হয়ে চলেছে। সামারভিল শুয়ে পড়েছে।

৯ই জুলাই

কাল ডায়ারি লিখতে পারিনি। লেখার মতো অবস্থা ছিল না। সেই জ্যোতিষীর গণনা শেষ পর্যন্ত ফলেছে। একটা কথা মানতেই হবে; শয়তানিতে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে বৈজ্ঞানিককে টেক্কা দেওয়া অসম্ভব। যাক গে, আপাতত কালকের অসামান্য ঘটনাগুলো বর্ণনায় মনোনিবেশ করি।

সকাল সাড়ে আটটায় ফিংকেলস্টাইনের সঙ্গে আপয়েন্টমেন্ট ছিল। টেলিফোন ডি঱েক্টেরিতে ফিংকেলস্টাইনের ঠিকানা দেখে সামারভিল বলল, ‘হেঁটে যাওয়া যেতে পারে। বেশি দূর না—আধ ঘণ্টায় পৌঁছে যাব।’ সামারভিলের চেনা শহর ইন্সুরুক। তা ছাড়া আমাকে টাঙ্গিতে তোলার বিপদের কথাও ও জানে।

আটটায় বেরিয়ে পড়লাম। প্রাচীন শহরের ভিতর দিয়ে রাস্তা। সামারভিল দেখলাম অলিগলির মধ্যে দিয়ে শর্টকাটগুলোও জানে। একটা গলি পেরিয়ে খোলা জায়গায় পড়তেই দেখি ডাইনে ছবির মতো সুন্দর সিল নদী বয়ে যাচ্ছে। আমরা নদীর ধার ধরে কিছু দূর গিয়ে বাঁয়ে একটা পার্ক ছাড়িয়ে আবার বাঁ দিকেই ঘুরে একটা নির্জন রাস্তায় পড়লাম। এটাই রোজেনবাউম আলে অর্থাৎ ফিংকেলস্টাইনের বাড়ির রাস্তা। এগারো নম্বর খুঁজে পেতে কোনোই অসুবিধা হল না।

ছোট অর্থাত ছবির মতো সুন্দর বাড়ি। সামনেই বাগান, তাতে নানা রঙের ফুল ফুটে রয়েছে, আর তারই মধ্যে সামনের দরজার ডান পাশে একটা আপেল গাছ দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মতো।

আমরা এগিয়ে গিয়ে দরজার বেল টিপলাম। একজন প্রোঢ় চাকর এসে দরজা খুলে দিল। আমাকে দেখেই তার মুখে হাসি ফুটে ওঠাটা কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগল।

‘আসুন ভেতরে……আপনি কিছু ফেলে গেছেন বুঝি?’

আমার বুকের ভিতরে যেন একটা হাতুড়ি পড়ল।

‘প্রোফেসর ফিংকেলস্টাইন আছেন?’ সামারভিলের গলার স্বরে সংশয়।

‘মনিব তো এখনো ঘরেই আছেন।’

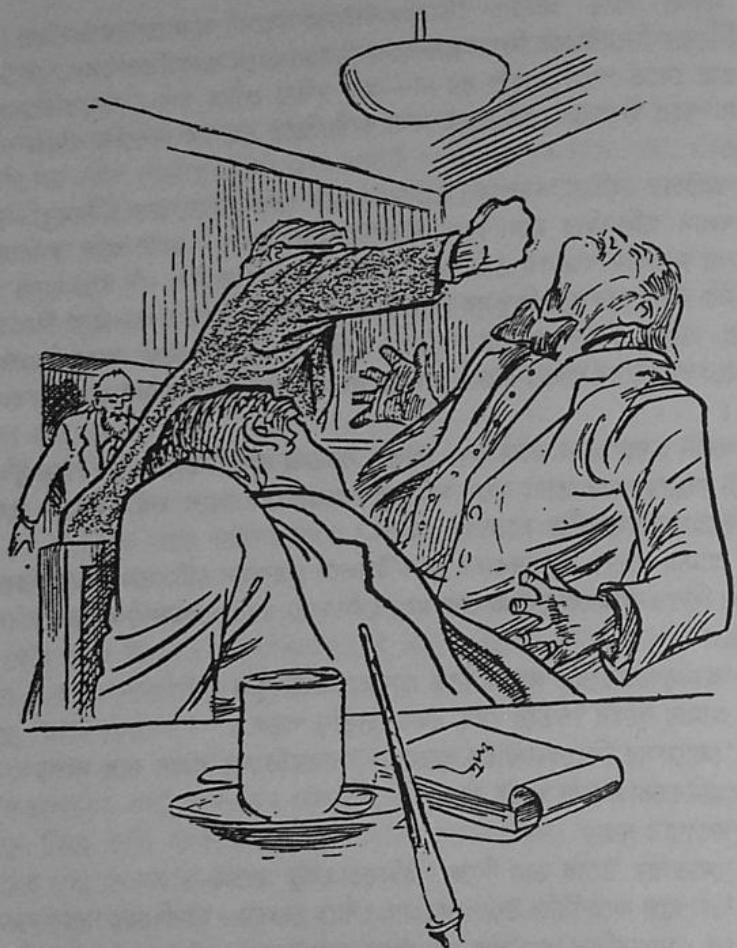
‘কোথায় ঘর?’

‘দোতলায় উঠেই ডান দিকে। ইনি তো একটু আগেই—’

তিনি ধাপ করে সিঁড়ি উঠে দোতলায় পৌঁছে গেলাম। ডানদিকের ঘরের দরজা খোলা। সামারভিল তার লম্বা পা ফেলে আগেই ঢুকে ‘মাই গড়! বলে দাঁড়িয়ে গেল।

এটা ফিংকেলস্টাইনের স্টাডি। মেহগানির টেবিলের সামনে অঙ্গুতভাবে মাথাটাকে পিছনে চিতিয়ে চেয়ারে বসে আছে ফিংকেলস্টাইন, তার হাত দুটো চেয়ারের দুপাশে ঝুলে রয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে দেখি, যা অনুমান করেছি তাই। ফিংকেলস্টাইনের মুখের দিকে চাওয়া যায় না। তাকে গলা টিপে মারা হয়েছে। কঠনালীর দুপাশে আঙুলের দাগ এখনো টাটক। এই দৃশ্য দেখে ফিংকেলস্টাইনের চাকর যেটা করল সেটাও মনে



রাখার মতো। একটা অঙ্কুট চিংকার করে আমার দিকে একটা বিশ্ফারিত দৃষ্টি দিয়ে সে টেবিলের উপর রাখা টেলিফোনটার উপর হুমড়ি দিয়ে পড়ল। তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট; সে পুলিশে খবর দেবে।

সামারভিল যেটা করল সেটা অবিশ্য তার উপস্থিত বুদ্ধির পরিচায়ক। সে এক ঘুঁঘিতে ভৃত্যটিকে ধরাশায়ী করল। দেখে বুলালাম, ভৃত্য অঙ্গান।

‘তুমি ফাঁদে পড়েছ, শঙ্কু! রুদ্ধাশাসে বলল সামারভিল। ‘মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করতে হবে।’

‘কিন্তু ওটা কী?’

আমার চোখ চলে গেছে টেবিলের উপর রাখা একটা প্যাডের দিকে। তাতে একটিমাত্র কথা লেখা রয়েছে লাল পেনসিলে—‘এস্টে। অর্থাৎ ফার্স্ট, প্রথম। আরো যে কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল ফিংকেলস্টাইনের সেটা কথাটার পরেই পেনসিলের দাগ থেকে বোৰা যাচ্ছে। পেনসিলটা পড়ে রয়েছে টেবিলের পাশে মেরোতে।

যা করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। ‘এস্টে’ লিখে কী বোৰাতে চেয়েছিল ফিংকেলস্টাইন? প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়—এইভাবে বোৰানো যেতে পারে এমন কী আছে ঘরের মধ্যে? বইয়ের তাক বোৰাতে পারে কি? মনে হয় না। আমি বুৰাতে পারছি কী জিনিসের অবস্থান বোৰাতে চেয়েছিল ফিংকেলস্টাইন। আমার চশমা।

জিনিসটা পাওয়া গেল টেবিলের প্রথম—অর্থাৎ ওপরের দেৱাজটা খুলে। কাগজপত্র কলম পেনসিল ইত্যাদির মধ্যে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স রাখা হয়েছে, তার ঢাকনাতে জার্মান ভাষায় লেখা ‘শঙ্কুর চশমা এবং চুল’। বাক্সটা নিয়ে আমরা দুজনে চম্পট দিলাম। ভৃত্য এখনো বেহঁশ।

সিডি দিয়ে নামার সময় লক্ষ করলাম জুতোর ছাপ; ওঠার সময় তাড়াতাড়িতে চোখে পড়েনি।

বাইরেও রয়েছে সেই ছাপ; দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেট ছাড়িয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। আসার ছাপ, যাওয়ার ছাপ, দূরকমই আছে। কাল রাত্রের বৃষ্টিই অবিশ্য এর জন্য দায়ী।

আমরা ছাপটা অনুসরণ করে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখি সেটা রাস্তা ছেড়ে ঘাসের উপর উঠে আদৃশ্য হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও আমরা পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম। দশ মিনিট এদিকে ওদিকে খুজেও যখন দ্বিতীয় শঙ্কুর কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না, তখন বাধ্য হয়ে হোটেলে ফিরে আসতে হল। মালিক আমাকে দেখেই বলল, ‘তোমার ফোন এসেছিল। ডক্টর গ্রোপিয়াস। তোমাকে অবিলম্বে টেলিফোন করতে বলেছেন।’

দোতলায় উঠে দেখি আমাদের পাশের ঘর আবার খালি হয়ে গেছে।

খাটে বসে পকেট থেকে বাক্সটা বার করলাম। খুলে দেখি শুধু চশমা নয়, তার সঙ্গে একটা ছোট্ট খামও রয়েছে। চশমাটা ঠিক আমার চশমারই মতো, কেবল কাঁচটা গ্রে রঙের। খামটা খুলতে তার থেকে একটা চিরকুট বেরোল, তাতে লেখা—‘লাইব্রেনিংস হলে বিজ্ঞান সভায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর শঙ্কুর চোখ থেকে খুলে পড়া চশমা-সংলগ্ন নাইলনের চুল।’

নাইলনের চুল?

খামের ভিতরেই ছিল চুলটা। দেখতে ঠিক পাকা চুলেরই মতো বটে, কিন্তু সেটা যে কৃত্রিম তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই চুল থেকেই ফিংকেলস্টাইন বুঝে ফেলেছিল যে বক্তৃতাসভার শঙ্কু আসল-শঙ্কু নয়।

কিন্তু আমার এই সংকটে ফিংকেলস্টাইনের সাহায্য লাভের আর কোনো উপায় নেই।

ঘরের দরজা বন্ধ ছিল; তাতে হঠাৎ টোকা পড়াতে দুজনেই চমকে উঠলাম। এ সময় আবার কে এল?

খুলে দেখি গ্রোপিয়াস।

সামারভিলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে গ্রোপিয়াসকে বসতে বললাম, কিন্তু সে বসল না। দরজার মুখে দাঁড়ানো অবস্থাতেই বলল, ‘আজ তোমাকে নিয়ে যাব বলেছিলাম, কিন্তু আজ ওয়েবারের একটু অসুবিধে আছে। তা ছাড়া আমার বাড়িতে আজ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। আমার এক চাকর ফ্রান্স কাল রাস্তারে প্রস্তুত মারা গেছে। আজ তার শেষকৃত্য; আমায় উপস্থিত থাকতে হবে।’

এর উভরে আমাদের কিছু বলার নেই; কয়েক মুহূর্ত বিরতির পর গ্রোপিয়াসই কথা বলল। এবার সে একটা প্রশ্ন করল।

‘ফিংকেলস্টাইন মারা গেছে জান কি?’

আমি যে ফিংকেলস্টাইনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলাম সেটা পাশের ঘর থেকে একজন লোক শুনেছিল সেটা মনে আছে। সে যদি গ্রোপিয়াসের অনুচর হয়ে থাকে তাহলে আমার সাড়ে আটকায় অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা গ্রোপিয়াসের কানে পৌঁছেছিল নিশ্চয়ই। তবুও আমি অজ্ঞতা ও বিস্ময়ের ভান করে বললাম, ‘সে কি! কখন?’

‘আজ সকালে। অ্যাকাডেমি অফ সায়ান্স থেকে ফোন করেছিল এই কিছুক্ষণ আগে। ওর চাকর আন্টন প্রথমে পুলিশে থবর দেয়, তারপর অ্যাকাডেমির প্রেসিডেন্ট গ্রোসমানকে ফোন করে।’

আমরা দুজনে চুপ। গ্রোপিয়াস এক পা এগিয়ে এল।

‘আন্টন একজন লোকের কথা বলেছে—গায়ের রঙ ময়লা, মাথায় টাক, দাঢ়ি আছে, চশমা আছে; আজ সকালে ফিংকেলস্টাইনের বাড়িতে গিয়েছিল। তার নামটাও বলেছিল আন্টন।’

‘বর্ণনা যখন আমার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, তাহলে নামটাও মিলতে পারে,’ আমি শাস্ত কঠে বললাম। ‘আর সেটাতে আশ্চর্য হ্বার কিছু নেই, কারণ সকালে সত্যিই গিয়েছিলাম ফিংকেলস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে সামারভিল ছিল। গিয়ে দেখি ফিংকেলস্টাইন মৃত। তাকে তুঁটি টিপে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।’

‘প্রোফেসর শঙ্কু,’ রক্ত জল করা গলায় বলল গ্রোপিয়াস, ‘বক্তৃতার ভাষার সাহায্যে বৈজ্ঞানিকদের আক্রমণ করা এক জিনিস, আর সরাসরি তাদের একজনকে আক্রমণ করে তাকে হত্যা করা আরেক জিনিস। তুমি নিজেই যখন বলছ তোমার মস্তিষ্কে কোনো গোলমাল নেই, তখন এই অপরাধের জন্য তোমার কী শাস্তি হবে সেটা তুমি জান নিশ্চয়ই?’

এবার সামারভিল মুখ খুলল। তারও কঠস্বর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

‘ডক্টর গ্রোপিয়াস, আপনি যখন বক্তৃতার দিন মঞ্চ থেকে শঙ্কুকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তার চোখ থেকে চশমাটি খুলে পড়ে যায়। ঘোলাটে কাঁচ, কতকটা সানগ্লাসের মতো। সেই চশমাটি ফিংকেলস্টাইন তুলে নেয়। চশমার ডান্ডায় একটি চুল আটকে ছিল। চুলটা নাইলনের। আজ ফিংকেলস্টাইনের চাকরের কথায় মনে হল শঙ্কুরই মতো দেখতে আরেকজন লোক আমাদের আধ ঘণ্টা আগে ফিংকেলস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে যাব। আমরা সিডিতে তার জুতোর ছাপ দেখেছি। বাড়ির বাইরে এবং রাস্তাতেও দেখেছি। এই লোকটি যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই খুনটা হয়। আততায়ী দস্তানা পরেনি। তার আঙুলের স্পষ্ট ছাপ ফিংকেলস্টাইনের গলায় ছিল। এই জাল-শঙ্কু যে-খুনটা করেছে, সেটা আপনি আসল শঙ্কুর ঘাড়ে চাপাবেন কী করে?’

গ্রোপিয়াস হঠাৎ হো হো করে এক অস্বাভাবিক হিংস্র তেজে হেসে উঠল।

‘কী করে চাপাবো সেটা দেখতেই পাবে! কাল শঙ্কু আমার বাড়িতে বসে আমার পেয়ালা থেকে হট চকোলেট খেয়েছে, আমার ফোটো আলবামের পাতা উলটে দেখেছে—এসবে কি আর তার আঙুলের ছাপ পড়েনি? আজকাল কৃত্রিম আঙুলের ছাপ তৈরি করা যায়। প্রোফেসর সামারভিল!—হান্স গ্রোপিয়াসের আবিক্ষার এটা! ইতিমধ্যে ইউরোপের তিনজন সেরা ক্রিমিন্যালকে আমি এর উপায় বাতলে দিয়েছি।’

এতক্ষণ লক্ষ করিন যে দরজার বাইরে গ্রোপিয়াসের আড়ালে আরেকটি লোক দাঁড়িয়ে আছে পকেটে হাত দিয়ে। একে আমি চিনি। এই লোকই সেদিন পাশের ঘর থেকে আড়ি পেতেছিল।

‘অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তোমার এই পরিণাম হতে চলেছে,’ গ্রোপিয়াস আমার দিকে চেয়ে বলল। ‘এই অবস্থায় পড়ে মাথা যদি সত্যিই খারাপ হয়, তাহলে অবিশ্য ওয়েবারের ক্লিনিক রয়েছে; সেখানে আমারই আবিক্ষুত পদ্ধতিতে ব্রেনসাপ্লাটের কাজ শুরু হয়েছে। এবারে বোধহয় আর আমাকে টেক্সা দিতে পারবে না! গুড ডে, শঙ্কু! গুড ডে, প্রোফেসর সামারভিল!’

গ্রোপিয়াস আর তার অনুচর সিডিতে ভারী শব্দ তুলে নিচে নেমে গেল। আমি খাটে বসে পড়লাম। সামারভিল পায়চারি শুরু করেছে। দুবার তাকে বলতে

শুনলাম—‘কী শয়তান ! কী শয়তান !’

আমি বুঝতে পারছি চারদিক থেকে জাল ধিরে আসছে আমাকে । আঙুলের ছাপও যদি মিলে যায় তাহলে আর বেরোবার কোনো পথ নেই । যদি না—

যদি না জাল-শুল্ককে খুঁজে বার করে পুলিশের সামনে উপস্থিত করা যায় ।

যদি না ফাঁদে যখন পড়েছি, পায়চারি থামিয়ে বলল সামারভিল, ‘তখন ফাঁদের শেষ
‘ফাঁদে যখন পড়েছি, পায়চারি থামিয়ে বলল সামারভিল, ‘তখন ফাঁদের শেষ

দেখে যেতে হবে । মরতে হলে লড়ে মরা ভালো, এভাবে নয় ।’

বুলাম আমার বিপদকে নিজের ঘাড়ে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করছে না
সামারভিল ।

চাবি দিয়ে সুটকেস খুলে রিভলভার বার করে সে পকেটে পুরল । বিজ্ঞানের
সঙ্গে সঙ্গে শিকারেও যে তার আশ্চর্য দখল সেটা সে ভিনিজুয়েলার জঙ্গলে
অনেকবার প্রমাণ করেছে । আমিও আমার ‘অ্যানাইহিলিন গান’ বা নিশ্চিহ্নস্ত্রী
সঙ্গে নিলাম । মাত্র চার ইঞ্জি লম্বা আমার এই আশ্চর্য অস্ত্রটি আমি পারতপক্ষে
ব্যবহার করি না ।

ঘরের দরজা বন্ধ করে সিডি দিয়ে নেমে আমরা হোটেলের বাইরে বেরিয়ে
এলাম । একটা ট্যাঙ্কি দেখে সেটাকে হাত তুলে থামিয়ে এগিয়ে যেতে ড্রাইভার
আমাকে দেখেই ‘নাইন, নাইন’ অর্থাৎ না না বলে মাথা নাড়ল । সেটাই আবার
‘ইয়া ইয়া’ হয়ে গেল যখন সামারভিল তার হাতে একটা একশো গ্রোশেনের নোট
গুঁজে দিল ।

একটুকুণ্ঠ আগেই একটা সাইরেনের শব্দ পেয়েছি ; আমাদের ট্যাঙ্কিটা যখন
রওনা হয়েছে তখন দেখলাম একটা পুলিশের গাড়ি আমাদের হোটেলের দিকে
যেতে যেতে আমাদের গাড়িটা দেখেই ব্রেক কফল ।

সামারভিল এবার একটা দুশো গ্রোশেনের নোট ড্রাইভারের হাতে দিয়ে বলল,
‘খুব জোরে চালাও—গুনেওয়াল্ডস্ট্রাসে যাব ।’

সকালে রোদ বেরিয়েছিল, কিন্তু এখন দেখছি পশ্চিম দিক থেকে কালো মেঘ
এসে আকাশটাকে ছেয়ে ফেলেছে । তার ফলে তাপমাত্রাও নেমে গেছে অস্তত
বিশ ডিগ্রী ফাৰেনহাইট । আমাদের মাসেডিস ট্যাঙ্কি ঝড়ের মতো এগিয়ে চলল
ট্রাফিক বাঁচিয়ে ।

মিনিট দশেক চলার পর পিছনে দূর থেকে আবার সাইরেনের শব্দ পেলাম ।
সামারভিল ড্রাইভারের পিঠে হাত দিয়ে একটা মৃদু চাপ দিল । ফলে আমাদের
গাড়ির গতি আরো বেড়ে গেল । স্পীডোমিটারের কাঁটা প্রায় একশো
কিলোমিটারের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে । চালকের অশেষ বাহাদুরি যে আমাদের
অ্যাঙ্কিডেটের হাত থেকে বাঁচিয়ে সে বিশ মিনিটের মধ্যে এনে ফেলল
গুনেওয়াল্ডস্ট্রাসে-তে ।

শঙ্কুর শনির দশা

সামনে একটা মিছিল, তাই বাধা হয়ে গাড়ির গতি কমাতে হল । দশ-বারোজন
লোক একটা কফিন নিয়ে বাঁয়ো গোরস্থানের গেটের ভিতর দিয়ে চুকে গেল । তার
মধ্যে দুজনকে চিনলাম—কাল যে চাকরটি হট চকোলেট এনে দিয়েছিল এবং
গ্রোপিয়াস নিজে ।

আমাদের গাড়ি গোরস্থানের গেট ছাড়িয়ে গ্রোপিয়াসের গেটে পৌঁছানোর ঠিক
আগে সামারভিল চেঁচিয়ে উঠল—

‘স্টপ দ্য কার !—গাড়ি ব্যাক কর ।’

বকশিস পাওয়া ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ গাড়ি থামিয়ে ব্যাক করে গোরস্থানের
গেটের সামনে এসে থামল । আমরাও নামলাম, আর সেই সঙ্গে সাইরেনের শব্দে
গোরস্থানের স্তুকতা চিরে পুলিশের গাড়ি এসে আমাদের ট্যাঙ্কির পিছনে সশব্দে
ব্রেক কফল ।

গোরস্থানে একটা সদ্য-খোঁড়া গর্তের পাশে রাখা হয়েছে কফিনটাকে ।
শব্দযাত্রাদের সকলেই আমাদের দিকে দেখছে—এমনকি গ্রোপিয়াসও ।

পুলিশের গাড়ি থেকে একজন ইন্স্পেক্টর ও আরো দুটি লোকের সঙ্গে নামলো
ফিংকেলস্টাইনের ভৃত্য আনটন, এবং নেমেই আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে
বললো, ‘ওই সেই লোক !’

পুলিশ অফিসার আমার দিকে এগিয়ে এলেন ।

গোরস্থানে পাদ্রী তার শেষকৃত্য শুরু করে দিয়েছে ।

‘প্রোফেসর শঙ্কু ! আমার নাম ইন্স্পেক্টর ডীট্রিখ । আপনাকে আমাদের সঙ্গে
একটু—’

দুম—দুম—দুম !

সামারভিলের রিভলভার তিনবার গর্জিয়ে উঠেছে । সঙ্গে সঙ্গে তিনবার কাঠ
ফাটার শব্দ ।

‘ওকে পালাতে দিও না !’—সামারভিল চিংকার করে উঠল—কারণ
গ্রোপিয়াস গোরস্থানের পিছন দিক লক্ষ্য করে ছুট দিয়েছে । একজন পুলিশের
লোক হাতে রিভলভার নিয়ে তার দিকে তীরবেগে ধাওয়া করে গেল । ইন্স্পেক্টর
ডীট্রিখ চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘যে পালাবে তাকেই শুলি করা হবে ।’

এদিকে আমার বিশ্ফারিত দৃষ্টি চলে গেছে কফিনের দিকে । তিনটের একটা
গুলি তার পাশের দেয়াল ভেদ করে ভিতরে চুকে গেছে । অন্য দুটো ঢাকনার
কানায় লেগে সেটাকে দ্বিখণ্ডিত করে স্থানচ্যুত করেছে ।

কফিনের ভিতর বিশাল দুটি নিষ্পলক পাথরের চোখ নিয়ে যিনি শুয়ে আছেন
তিনি হলেন আমারই ডুপ্পিকেট—শঙ্কু নাম্বার টু ।

এবাবে সমবেত সকলের রক্ত হিম করে, ডীট্রিখের হাত থেকে রিভলভার

খসিয়ে দিয়ে, পুলিশের বগলদাবা গ্রোপিয়াসকে অঙ্গান করে দিয়ে, কফিনবদ্ধ দ্বিতীয় শঙ্কু ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। বুবলাম তাঁর পাঁজরা দিয়ে গুলি প্রবেশ করে তাঁর দেহের ভিতরের যন্ত্র বিকল করে দিয়েছে; কারণ ওই বসা অবস্থাতেই গ্রোপিয়াস-সৃষ্টি জাল শঙ্কু তাঁর শরীরের ভিতরে রেকর্ড করা একটি পুরানো বড়তা দিতে শুরু করেছেন—

‘ভদ্রমহোদয়গণ!—আজ আমি যে কথাগুলো বলতে এই সভায় উপস্থিত হয়েছি, সেগুলো আপনাদের মনঃপূত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু—’
আমি আমার অ্যানাইলিন বন্দুকটি পকেট থেকে বার করলাম। আমার এই পৈশাচিক জোড়াটিকে পথিবীর বুক থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পারলে তবেই আমার মুক্তি।

নকুড়বাবু ও এল ডোরাডো

৬৫

১৩ই জুন

আজ সকালের ঘটনাটা আমার কাজের রুটিন একেবারে তচনছ করে দিল। কাজটা অবিশ্য আর কিছুই না; আমার যাবতীয় আবিকার বা ইনভেনশনগুলো সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখছিলাম সুইডেনের বিখ্যাত কসমস পত্রিকার জন্য। এ-কাজটা এর আগে কখনো করিনি, যদিও নানান দেশের নানান পত্রিকা থেকে অনুরোধ এসেছে অনেকবার। সময়ের অভাবে প্রতিবারই প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। ইদানীং আমার গবেষণার কাজ ইচ্ছে করেই অনেক কমিয়ে দিয়েছি। এটা ক্রমেই বুঝতে পারছি যে, গিরিডির মতো জায়গায় বসে আমার গবেষণাগারের সামান্য উপকরণ নিয়ে আজকের যুগে শুধু যে আর বিশেষ কিছু করা যায় না তা নয়, করার প্রয়োজনও নেই। দেশে-বিদেশে বছ তরণ বৈজ্ঞানিক আশ্চর্য সব আধুনিক যন্ত্রপাতি হাতে পেয়ে, এবং সেই সঙ্গে নানান বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় যে-সব কাজ করছে তা সত্যই প্রশংসনীয়। অবিশ্য আমি নিজে সামান্য ব্যয়ে সামান্য মালমশলা নিয়ে যা করেছি তার স্বীকৃতি দিতে বৈজ্ঞানিক মহল কার্পণ্য করেনি। সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেই আবার এমন লোকও আছে, যারা আমাকে বৈজ্ঞানিক বলে মানতেই চায়নি। তাদের ধারণা, আমি একজন জানুকর বা প্রেতসিদ্ধ গোছের কিছু; বৈজ্ঞানিকের চোখে ধূলো দেবার নানারকম মন্ত্রতত্ত্ব আমার জানা আছে, আর তার জোরেই আমার প্রতিষ্ঠা। আমি অবশ্য এটা নিয়ে কোনোদিনই নিজেকে উত্তেজিত হতে দিইনি। আমার মধ্যে যে একটা ঝিয়সুলভ হৈর্য ও সংযম আছে সেটা আমি জানি। এককথায় আমি মাথা-ঠাণ্ডা মানুষ। পশ্চিমে এমন অনেক জ্ঞানী-গুণী গবেষকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, যাঁরা কথায়-কথায় টেবিল চাপড়ান, বা টেবিলের অভাবে নিজেদের হাঁটু। জামনির এক জীবরাসায়নিক ডঃ

হেল্পেনার একবার তাঁর এক নতুন আবিক্ষারের কথা বলতে গিয়ে উদ্বেজিত হয়ে আমার কাঁধে এমন এক চপেটাঘাত করেছিলেন যে, যন্ত্রণায় আমাকে আর্তনাদ করে উঠতে হয়েছিল।

যাই হোক, এই প্রবন্ধে একটা জিনিস বুঝিয়ে বলার সুযোগ পাচ্ছি ; সেটা আমার আবিক্ষারগুলো কেন আমি সারা পৃথিবীর ব্যবহারার্থে ছড়িয়ে দিইনি। তার কারণ আর কিছুই না—আমার তোর জিনিসগুলোর মধ্যে যেওভো সবচেয়ে শক্তিশালী বা হিতসাধক—যেমন আনাইহিলিন পিস্টল বা মিরাকিউরল ওযুধ বা অমনিস্কোপ বা মাইক্রোসোনোগ্রাফ, বা স্বতি-উদ্যাটক যন্ত্র রিমেম্ব্রেন—এর কোনোটাই কারখানায় তৈরি করা যায় না। এগুলো সবই মানুষের হাতের কাজ এবং সে-মানুষও একটি বৈ আর দ্বিতীয় নেই। তিনি হলেন ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু।

আজ ভোরে যথারীতি উত্তীর্ণ ধারে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে কফি খেয়ে আমার লেখাপড়ার ঘরে বসে আমার পঞ্চাশ-বছর-ব্যবহার-করা ওয়াটারম্যান ফাউন্টেন পেন্টাতে কালি ভরে লেখা শুরু করতে যাব, এমন সময় আমার চাকর প্রহ্লাদ এসে বলল একটি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

“কোন দেশীয় ?” প্রশ্ন করলাম আমি। স্বাভাবিক প্রশ্ন, কারণ পৃথিবীর খুব কম দেশই আছে, যেখানকার গুণী-জ্ঞানীর কেউ-না-কেউ কোনোদিন-না-কোনোদিন এই গিরিডিতে আমার বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেননি। তিনি সপ্তাহ আগে লিথুয়ানিয়া থেকে এসেছিলেন বিশ্ববিদ্যাত পতঙ্গ-বিজ্ঞানী প্রোফেসর জাবলনক্সি।

“তা তো জিগ্যেস করিনি,” বলল প্রহ্লাদ, “তবে ধুতি দেখলাম, আর খদরের পাঞ্জাবি, আর কথা তো বললেন বাংলাতেই।”

“কী বললেন ?” কথাটা অপ্রীতিকর শোনালেও স্বীকার করতেই হবে যে, মামুলি লোকের সঙ্গে মামুলি খেজুরে আলাপের সময় নেই আমার।

“বললেন কী, তোমার বাবুকে বলো কিসমিসের জন্য লেখাটা একটু বন্ধ করে যদি দশ মিনিট সময় দেন। কী যেন বলার আছে।”

কিসমিস ? তার মানে কি কিসমিস ? কিন্তু তা কী করে হয় ? আমি যে কিসমিস পত্রিকার জন্য লিখছি, সে-কথা তো এখানে কেউ জানে না !

উঠে পড়লাম লেখা ছেড়ে। কিসমিস-বহস্য ভেদ না করে শান্তি নেই।

বসবার ঘরে চুকে যাঁকে দু' হাতের মুঠোয় ধূতির কোঁচা ধরে সোফার এক পাশে জবুথু হয়ে বসে থাকতে দেখলাম, তেমন নিরাহ মানুষ আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। যদিও প্রথম চাহনির পর দ্বিতীয়তে লক্ষ করা যায় এর চোখের মণির বিশেষত্বা : এর মধ্যে যেটুকু প্রাণশক্তি আছে, তার সবটুকুই যেন ওই

মণিতে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

“নমক্ষার তিলুবাবু !” কোঁচার ডগা সমেত হাত দুটো মুঠো অবস্থায় চলে এল ভদ্রলোকের থুতনির কাছে।—“কসমসের লেখাটা বন্ধ করলাম বলে মার্জিনা চাইছি। আপনার সঙ্গে সামান্য কয়েকটা কথা বলার প্রবল বাসনা নিয়ে এসেছি আমি। আমি জানি আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।”

শুধু ক্ষমতা নয়, তিলু-শামাতা ব্যবহার করাটাও একটা প্রচণ্ড বিশ্বয়-উদ্বেক্ষকারী ব্যাপার। যাট বছর আগে আমার বাবা শেষ আমায় ডেকেছেন ওই নামে। তার পরে ডাকলাম্বাটার আর কোনো প্রয়োজন হয়নি।

“অধমের নাম শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস !”

আমার বিশ্বয় কাটেনি, তাই ভদ্রলোকই কথা বলে চলেছেন।

“মাকড়দায় থাকি ; ক’দিন থেকেই আপনাকে দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। অবিশ্য সে-দেখা আর এ-দেখা এক জিনিস নয়।”

“আমাকে দেখতে পাচ্ছেন মানে ?” আমি প্রশ্ন করতে বাধ্য হলাম।

“এটা মাস দেড়েক হল আরম্ভ হয়েছে। অন্য জায়গার লোক, অন্য জায়গার ঘটনা, এইসব হঠাতে চোখের সামনে দেখি। সব সময় খুব স্পষ্ট নয়, তাও দেখি। আপনার নাম শুনেছি, ছবিও দেখেছি কাগজে। সেদিন আপনার চেহারাটা মনে করতেই দেখি আপনি এসে হাজির।”

“এ জিনিস দেড় মাস থেকে হচ্ছে আপনার ?”

“হ্যাঁ। তা দেড় মাসই হবে। খুব জল হচ্ছিল সেদিন, আর তার সঙ্গে মেঘের ডাক। দুপুরবেলা। দাওয়ায় বসে গোলা তেতুলের আচার খাচ্ছি, হঠাতে দেখি সামনে বিশ হাত দূরে মিত্রিদের বাড়ির ভেরেণ্ডা গাছের পিছন দিকে একটা আগুনের গোলার মতো কী যেন শুন্যে ঘোরাফেরা করছে। বললে বিশ্বাস করবেন না, তিলুবাবু, গোলাটা এল ঠিক আমারই দিকে। যেন একটি জ্যোতির্ময় ফুটবল। উঠোনে তুলসীর কাছ অবধি আসতে দেখেছি এটা মনে আছে, তারপর আর মনে নেই। জ্বান যখন হল তখন জল খেমে গেছে। আমি ছিলাম তক্ষপোশে ; তিনটে বেড়ালছানা খেলা করছিল উঠোনে, দাওয়ার ঠিক সামনেই। সে-তিনটে মরে গেছে। অথচ আমার গায়ে আঁচড়টি নেই। আমাদের বাড়ির পিছনে একটা মাদার গাছ আর একটা কতবেল গাছ ছিল, দুটোই পুড়ে ঝামা।”

“আর বাড়ির অন্য লোক ?”

“ঠাকুমা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। ছোট ভাই ছিল ইঙ্গুলে ; সে মাকড়দা প্রাইমারি ইঙ্গুলের মাস্টার। মা নেই ; বাবা ছিলেন ননী ঘোষের বাড়ি, দাবার আড়াড়ায়। ঠাকুমার অসুখ। খাটে শুয়ে ছিলেন পিছন দিকের ঘরে, তাঁর কিছু হয়নি।”

বর্ণনা শুনে মনে হল ‘বল লাইটনিং’-এর কথা বলছেন ভদ্রলোক। কচিং কদাচিং এ ধরনের বিদ্যুতের কথা শোনা যায়, যেটা ঠিক বলেরই আকার ধরে কিছুক্ষণ শূন্য দিয়ে ভেসে বেড়িয়ে হঠাত এক্সপ্লোড করে। সে-বিদ্যুৎ একটা মানুষের কাছ দিয়ে যাবার ফলে যদি দেখা যায় যে সে-মানুষের মধ্যে একটা মানুষের কাছ দিয়ে যাবার ফলে যদি দেখা যায় যে সে-মানুষের মধ্যে একটা বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে গেছে, তাহলে বলার কিছু নেই। কাছাকাছি বাজ পড়ে কাগজ কালে উচ্চারণ করে দ্রুত ফিলে পেয়েছে, এমন খবরও কাগজে পড়েছি। প্রশ্ন হচ্ছে, এই ভদ্রলোকের শক্তির দৌড় কতদূর।

প্রশ্নটা করার আগেই উত্তরের খানিকটা আভাস পেয়ে গেলাম।

নকুড়বাবু হঠাত বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, “গ্রি এইট এইট এইট নাইন ওয়ান সেভেন ওয়ান।” দেখলাম তিনি চেয়ে রয়েছেন সামনে টেবিলের উপর রাখা আমেরিকান সাপ্তাহিক ‘টাইম’-এর মলাটের দিকে। মলাটে যাঁর ছবি রয়েছে তিনি হলেন মার্কিন ক্রোডপতি পেট্রস সারকিসিয়ান। ছবির দিকে চেয়েই নকুড়বাবু বলে চলেছেন, “সাহেবের ঘরে একটা সিন্দুক দেখতে পাচ্ছি—খাটের ডান পাশে—ক্রস্টলি কোম্পানির তেরি—ভিতরে ঢাকা—বাণিল-বাণিল একশো ডলারের নেট...”

“আর আপনি যে-নম্বরটা বললেন, সেটা কী ?”

“ওটা সিন্দুকটা খোলার নম্বর। ডালার গায়ে একটা দাঁত-কাটা চাকার মতো জিনিস, আর সেটাকে ঘিরে খোদাই করা এক থেকে নয় অবধি নম্বর। চাকাটা এদিকে-ওদিকে ঘোরে। নম্বর মিলিয়ে ঘোরালেই খুলে যাবে সিন্দুক।”

কথাটা বলে হঠাত একটা ভীষণ কুঠার ভাব করে ভদ্রলোক বললেন, “অপরাধ নেবেন না তিলুবাবু। এসব কথা আপনার মতো ব্যস্ত মানুষের কাছে বলতে আসা মানেই আপনার মূল্যবান সময়—”

“মোটেই না,” আমি বাধা দিয়ে বললাম। “আপনার মতো ক্ষমতা একটা দুর্লভ ব্যাপার। আপনার সাক্ষাৎ পাওয়াটা একজন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের কথা। আমি শুধু জানতে চাই—”

“আমি বলছি আপনাকে। আপনি জানতে চাইছেন ‘বল লাইটনিং’-এর সংস্পর্শে এসে আমার মধ্যে আর কী কী বিশেষ ক্ষমতা দেখা দিয়েছে, এই তো ?”

নির্ভুল অনুমান। বললাম, “ঠিক তাই।”

নকুড়বাবু বললেন, “মুশকিল হচ্ছে কী জানেন ? এগুলোকে তো আর বিশেষ ক্ষমতা বলে ভাবতে পারি না আমি ! মানুষ যে হাসে বা কাঁদে বা হাই তোলে বা নাক ডাকায়—এগুলোকে কি আর মানুষ বিশেষ ক্ষমতা বলে মনে করে ? এ তো নিশাস-প্রশ্বাসের মতোই স্বাভাবিক। আমিও যা করছি সেগুলো বিশেষ ক্ষমতা ভেবে করছি না। যেমন ধরুন আপনার ওই টেবিলটা। ওটার ওপর কী রয়েছে

বলুন তো ?”

আমি ভদ্রলোকের ইঙ্গিত অনুসরণ করে আমার ঘরের কোণে রাখা কাশীরী টেবিলটার দিকে দেখলাম।

টেবিলের উপর একটা জিনিস রয়েছে যেটা এর আগে কোনোদিন দেখিনি। সেটা একটা পিতলের মৃত্তি—যদিও খুব স্পষ্ট নয়। যেন একটা স্পন্দনের ভাব, একটা স্বচ্ছতা রয়েছে মৃত্তিটার মধ্যে। দেখতে-দেখতেই মৃত্তিটা মিলিয়ে গেল।

“কী দেখলেন ?”

“একটা পিতলের ধ্যানী-বুদ্ধমৃত্তি। তবে ঠিক নিরোট নয়।”

“ওইতোবললুম। এখনো ঠিক রপ্ত হয়নি ব্যাপারটা। মৃত্তিটা রয়েছে আমাদের উকিল শিবরতন মলিকের বাড়ির বৈঠকখানায়। একবার দেখেছিলুম। এখনকার মতো আপনার ওই টেবিলে আছে বলে কল্পনা করলুম, কিন্তু পুরোপুরি এল না।”

আমি মনে-মনে বলছিলাম, আজ পর্যন্ত প্রথমবারের কোনো জাদুকর (একমাত্র চীনে জাদুকর চী চিং ছাড়া) আমাকে হিপনোটাইজ করতে পারেনি। ইনি কিন্তু অনেকটা সমর্থ হয়েছেন। এও একরকম সম্মোহন বই কী ! নকুড় বিশ্বাসের একাধিক ক্ষমতার মধ্যে এটাও একটা। হিপনোটিজম, টেলিপ্যাথি, ক্লেয়ারভয়েন্স বা অলোকদৃষ্টি—এ সব ক'টা ক্ষমতাই দেখছি একসঙ্গে পেয়ে গেছেন ভদ্রলোক।

“শিবরতনবাবুর কাছেই আপনার কথা প্রথম শুনি,” বললেন নকুড়বাবু। “তাই ভাবলুম একবার গিরিডিটা হয়ে আসি। আপনার দর্শনটাও হয়ে যাবে, আর সেই সঙ্গে একটা ব্যাপারে আপনাকে একটু সাবধানও করে দিতে পারব।”

“সাবধান ?”

“আজ্ঞে কিছু মনে করবেন না, তিলুবাবু, ধৃষ্টতা মাপ করবেন ; আমি জানি আপনি তো শুধু আমাদের দেশের লোক নন ; সারা বিশ্বে আপনার সম্মান, প্রথিবীর সব জায়গা থেকেই আপনার ডাক পড়ে, আর আপনাকে সে সব ডাকে সাড়াও দিতে হয়। কিন্তু সাও পাউলোর ব্যাপারটাতে গেলে আপনাকে বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করি।”

সাও পাউলো হল ব্রেজিলের সব চেয়ে বড় শহর। সেখান থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো ডাক আসেনি আমার। বললাম, “সাও পাউলোতে কী ব্যাপার ?”

“আজ্ঞে সেটা এখনো ঠিক বলতে পারলাম না। ব্যাপারটা এখনো ঠিক স্পষ্ট নয় আমার কাছে। সত্যি বলতে কী, সাও পাউলো যে কোথায় তাও আমি জানি না। হঠাত চোখের সামনে দেখতে পেলুম একটা লম্বা সাদা খাম, তার উপর টাইপ করা আপনার নাম ও ঠিকানা, খামের এক কোণে একটা নতুন ডাকটিকিট, তার উপর একটা ছাপ পড়ল—‘সাও পাউলো’—আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। আর তার পর মুহূর্তেই দেখলুম একটা সুদৃশ্য কামরা, তাতে এক

বিশালবপু বিদেশী ভদ্রলোক আপনার দিকে চেয়ে বসে আছেন। লোকটিকে দেখে মোটেই ভাল লাগল না।"

দশ মিনিট হয়ে গেছে দেখেই বোধহয় ভদ্রলোক উঠে পড়ছিলেন, আমি বসতে বললাম। অস্তু এক কাপ কফি না খাইয়ে ছাড়া যায় না ভদ্রলোককে। তা ছাড়া ভবিষ্যতে গ্রে সঙ্গে যোগাযোগ করার কী উপায় সেটাও জানা দরকার।

ভদ্রলোক রীতিমতো সঙ্গে সঙ্গে আধা-ওঠা অবস্থা থেকে বসে পড়লেন। বললাম, "আপনি উঠেছেন কোথায়?"

"আজ্ঞে, উঠেছি মনোরমা হোটেলে।"

"থাকবেন ক'দিন?"

"যে কাজের জন্য আসা সে কাজ তো হয়ে গেল, কাজেই..."

"কিন্তু আপনার ঠিকানাটা যে জানা দরকার।"

লজ্জায় ভদ্রলোকের ঘাড় বেঁকে গেল। সেই অবস্থাতেই বললেন, "আমার ঠিকানা আপনি চাইছেন এ তো বিশ্বাসই করতে পারছি না।"

এবার ভদ্রলোককে একটু কড়া করেই বলতে হল যে তাঁর বিনয়টা একটু আদিখ্যেতার মতো হয়ে যাচ্ছে। বললাম, "আপনি জেনে রাখুন যে, আপনার সঙ্গে মাত্র দশ মিনিটের পরিয়ের পর একেবারে যোগবিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটা যে-কোনো বৈজ্ঞানিকের পক্ষেই একটা আপসোসের কারণ হতে পারে।"

"আপনি কেয়ার অফ হরগোপাল বিশ্বাস, মাকড়দা দিলেই আমি চিঠি পেয়ে যাব। আমার বাবাকে ওখানে সবাই চেনে।"

"আপনি বিদেশ যাবার সুযোগ পেলে যাবেন?"

প্রশ্নটা কিছুক্ষণ থেকেই মাথায় ঘূরছিল। সেটার কারণ আর কিছুই না—অতিথাকত ক্ষমতা বা ঘটনা সম্পর্কে পশ্চিমে অনেক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একটা হেসে উড়িয়ে দেবার ভাব লক্ষ করেছি। শ্রীমান নকুড় বিশ্বাসকে একবার তাদের সামনে নিয়ে ফেলতে পারলে মন্দ হত না। আমি নিজে অবিশ্য এই সন্দেহবাদীদের দলে নই। নকুড়বাবুর এই ক্ষমতা আমি মোটেই অবজ্ঞা বা অবিশ্বাসের চোখে দেখি না। মানুষের মিস্কিন সম্বন্ধে আমরা এখনো স্পষ্টভাবে কিছুই জানি না। আমার ঠাকুরদা বটুকেশ্বর ছিলেন শ্রুতিধর। একবার শুনলে বা পড়লেই একটা গোটা কাব্য তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। অথচ তিনি পুরোদস্তর সংসারী লোক ছিলেন; এমন না যে দিন-রাত কেবল পড়াশুনা বা ধর্মকর্ম নিয়ে থাকতেন। এটা কী করে সন্তুষ্য হয় সেটা কি পশ্চিমের কোনো বৈজ্ঞানিক সঠিক বলতে পারে? পারে না, কারণ তারা এখনো মস্তিষ্কের অর্ধেক রহস্যই উদ্ঘাটন করতে পারেনি।

কিন্তু আমার প্রশ্ন শুনে নকুড়বাবু এমন ভাব করলেন যেন আমি উন্মাদের

মতো কিছু বলে ফেলেছি।

"আমি বিদেশ যাব?" ঢোক কপালে তুলে বললেন নকুড়বাবু। "কী বলছেন আপনি তিলুবাবু? আর যদি বা ইচ্ছেই থাকত, আমার মতো লোকের পক্ষে সেটা সন্তুষ্য বা হত কী করে?"

আমি বললাম, "বাইরের অনেক বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানই কোনো বিজ্ঞানী-সম্মেলনে কাউকে আমন্ত্রণ জানালে তাঁকে দুটো প্লেনের টিকিট দিয়ে থাকেন, এবং সেখানে দুজনের থাকার খরচ বহন করে থাকেন। কেউ-কেউ নিয়ে যান স্বীকৃত, কেউ বা সেক্রেটারিকে। আমি অবশ্য একাই গিয়ে থাকি, কিন্তু আপনি যেতে সম্মত হলে—"

নকুড়বাবু একসঙ্গে মাথা নেড়ে, জিভ কেটে আমার প্রস্তাবে ঘোর আপন্তি জানিয়ে উঠে পড়লেন।

"আপনি যে আমার কথাটা ভেবেছেন সেইটেই আমার অনেক পাওয়া। এর বেশি আর আমি কিছু চাই না।"

আমি কিছুটা ঠাট্টার সুরে বললাম, "যাই হোক, যদি আপনার দিব্যদৃষ্টিতে কোনোদিন আপনার বিদেশ যাবার সন্তাবনা দেখতে পান, তাহলে আমাকে জানাবেন।"

নকুড়বাবু যেন আমার রসিকতাটা উপভোগ করেই মৃদু হেসে দু'হাতে কৌচার গোছটা তুলে নিয়ে নমস্কার করে বললেন, "আমার প্রণাম রইল। নিউটনকে আমার আশীর্বাদ দেবেন।"

২১শে জুন

কসমস পত্রিকার জন্য প্রবন্ধটা কাল পাঠিয়ে দিলাম।

শ্রীমান নকুড়চন্দ্রের আর কোনো খবর পাইনি। সে নিজে না-দিলে আর কে দেবে খবর। আমার দিক থেকে খুব বেশি আগ্রহ দেখানোটাও ঠিক নয়, তাই ঠিকানা জানা সত্ত্বেও আমি তাকে চিঠি লিখিনি। অবিশ্য ইতিমধ্যে আমার দুই বছু সন্দৰ্ভ ও ক্রোলকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছি। তারা দু'জনেই গভীর কৌতুহল প্রকাশ করেছে। ক্রোল বলছে, নকুড় বিশ্বাসকে ইউরোপে নিয়ে গিয়ে ডেমনস্ট্রেশনের জন্য খরচ সংগ্রহ করতে কোনো অসুবিধা হবে না। এমনকি, টেলিভিশন প্রোগ্রাম ইত্যাদির জোরে নকুড় বিশ্বাস বেশ কিছু টাকা হাতে নিয়ে দেশে ফিরতে পারবে। আমি জানিয়ে দিয়েছি, মাকড়দাবাসীর কাছ থেকে উৎসাহের কোনো ইঙ্গিত পেলেই জানাব।

২৪শে জুনাই

২৪শে জুলাই
গত এক মাসে আমার প্রবন্ধটা সম্পর্কে একশো সাতাত্তরটা চিঠি পেয়েছি
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে। সবই অভিনন্দনসূচক। তার
মধ্যে একটি চিঠি হল এক বিরাট মার্কিন কেমিকাল কর্পোরেশনের মালিক
সলোমন ব্লুমগার্টেনের কাছ থেকে। তিনি জানিয়েছেন যে, আমার অস্তত তিনটি
আবিষ্কারের পেটেট স্বত্ত্ব তিনি কিন্তু রাজী আছেন। তার জন্য তিনি আমাকে
পঁচাত্তর হাজার ডলার দিতে প্রস্তুত। আবিষ্কার তিনটি হল অ্যানাইহিলিন পিস্তল,
মিরাকিউরল বড়ি ও অমনিস্কোপ যন্ত্র। যদিও আমি প্রবন্ধে লিখেছিলাম যে, এসব
জিনিস কারখানায় তৈরি করা যায় না, সে-কথাটা ব্লুমগার্টেন মানতে রাজী নন।
তাঁর ধারণা, একজন মানুষ নিজে হাতে যেটা তৈরি করতে পারে, যন্ত্রের সাহায্যে
সেটা তৈরি না করতে পারার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। এসব ব্যাপারে চিঠি
মারফত তর্ক করা বৃথা; তাই আমি জানিয়ে দিয়েছি যে, ব্যক্তিগত কারণে আমি
পেটেট ব্রাইটস বিক্রি করতে রাজী নই।

পঁচাত্তর হাজার ডলারেও আমার লোভ লাগল না দেখে সাহেবের না জান কা
প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

১৭ই আগস্ট

ଆজ এক অপ্রত্যাশিত চিঠি । লিখছেন আনন্দভূষণ বিশ্বাস । চাঠর ভাব ও
ভাষা দুইই অপ্রত্যাশিত । তাই সেটা তুলে দিচ্ছি—

ଶ୍ରୀତିଲୋକେଶ୍ୱର ଶକ୍ତୁ ମହାଶୟେର ଶ୍ରୀଚରଣେ ଶତ କୋଟ ପ୍ରଗମପୂର୍ବକ
ନିବେଦନମିଦଃ—
ମହାଶୟ,

অধমকে যে আপনি স্মরণে রাখিয়াছেন সে-বিষয়ে অবগত আছি।
অবিলম্বে সাও পাউলো হইতে আমন্ত্রণ আপনার হস্তগত হইবে। আপনি সঙ্গত
কারণেই উক্ত আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না। আপনার স্মরণে
থাকিবে যে, আপনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন আপনার দাসানুদাস
সেক্রেটারিলাপে আপনার সহিত বিদেশ গমনের জন্য। তৎকালে সম্ভত হই
নাই, কিন্তু স্বগ্রহে প্রত্যাবর্তনের পর ক্রমে উপলব্ধি করিয়াছি যে, সাও
পাউলোতে আপনার পার্শ্বে উপস্থিত না থাকিলে আপনার সমৃহ বিপদ। আমি
গত কয়েক মাস অঙ্গাস্ত পরিশ্রমে পিটম্যান পদ্ধতিতে শর্টহ্যান্ড বিদ্যায়
পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি। উপরন্ত এটিকেট সম্পর্কে কতিপয় পুস্তক পাঠ
করিয়া পাশ্চাত্য আদবকায়দা কিছুটা আয়ত্ত করিয়াছি। অতএব আপনি
আমাকে আপনার অন্তর রূপে সঙ্গে লইবার ব্যাপারে কী স্থির করেন তাহা

পত্রপাঠ জানাইলে বাধিত হইব। আপনি ভারতের তথা বিশ্বের গৌরব।
সর্বোপরি আপনি বঙ্গসন্তান। আপনার দীর্ঘ, রোগমুক্ত, নিঃসংক্ষিট জীবন
আমাদের সকলেরই কামা। টুতি।

সেবক শ্রীনকুড়চন্দ বিশ্বাস

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে—আমার সঙ্গে বাইরে যাবার ব্যাপারে হঠাৎ মত পরিবর্তনের কারণ যেটা বলছেন নকুড়বাবু, সেটা কি সত্যি? নাকি এর মধ্যে কোনো গৃহ্ণ অভিসন্ধি আছে? ভদ্রলোক কি আসলে গভীর জলের মাছ? চিঠির ভাব ও ভাষা কি আসলে আদিখ্যেতা?

ଲୋକଟାର ମଧ୍ୟେ ସତିଇ କତକଗୁଲୋ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ଆଛେ ବଲେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋ ଆସଛେ । ଅବଶ୍ୟ ଏଥିନ ଏ-ବିଷୟେ ଭେବେ ଲାଭ ନେଇ । ଆଗେ ନେମସ୍ତନ୍ତଟା ଆସେ କିନା ଦେଖା ଯାକ, ତାରପର ଅବସ୍ଥା ବୁଝେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।

৩৪ সেপ্টেম্বর

নকুড়বাবু আবাক করলেন। আমন্ত্রণ এসে গেছে। আরো অবাক হয়েছি এই কারণে যে, এ-আমন্ত্রণ সত্যিই ঠেনা যাবে না। সাও পাউলোর বিখ্যাত রাটানটান ইনসিটিউট একটা তিনদিনব্যাপী বিজ্ঞান সম্মেলনের আয়োজন করেছেন, যেখানে বক্তৃতা, আলোচনা-সভা ইত্যাদি তো হবেই, তা ছাড়া সম্মেলনের শেষ দিনে ইনসিটিউট আমাকে ডক্টরেট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করবে। কসমসের প্রবন্ধই আসলে নতুন করে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছে বিজ্ঞানের জগতে। সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ যে শুধু আমার উপস্থিতি প্রার্থনা করেছেন তা নয়, আমার সব ক'র্টি ইনভেনশন এবং সেই সঙ্গে সেই সংক্রান্ত আমার গবেষণার কাগজপত্রের একটি প্রদর্শনী করবেন বলে প্রস্তাৱ করেছেন। এ ব্যাপারে দিল্লির ব্ৰেজিলীয় এমব্যাসিৱ সঙ্গে ভাৱত সৱকাৱ সবৱকম সহায়তা কৰতে প্ৰস্তুত আছেন বলে জানিয়েছেন। ইনসিটিউট জানিয়েছেন যে, তাঁদেৱ আতিথেয়তা তিন দিনেই ফুৱিয়ে যাচ্ছে না, অস্তত আৱো সাত দিন থকে যাতে আমি ব্ৰেজিল ঘুৱে দেখতে পাৱি সে-ব্যবস্থাও কৰ্তৃপক্ষ কৰবেন। দু'জনেৱ জন্য থাকাৱ এবং যাতায়াতেৱ খৰচ তাঁৰা বহন কৰবেন।

আমি যাব বলে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি, আর এও জানিয়ে দিয়েছি যে, আমার
সঙ্গে থাকবেন আমার সেক্রেটারি মিঃ এন সি বিসওয়াস।

ମାକଡ୍‌ଦାତେଓ ଅବଶ୍ୟ ଚିଠି ଚଲେ ଗେଛେ । କନଫାରେସ ଶୁରୁ ହଛେ ୧୦େ
ଆଷ୍ଟୋବେଳ । ଏହି ଏକ ମାସେର ମଧ୍ୟେ ସବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଫେଲାତେ ପାରବ ବଲେ ମନେ ହୁଏ ।

সন্দার্শ ও ক্রোলকে খবরটা দিয়ে দিয়েছি। লক্ষপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসাবে

দু'জনেই সাও পাউলোতে আমন্ত্রিত হবেন বলে আমার বিশ্বাস, তবে নকুড়বাবুর খবরটা জানিয়ে দেওয়া দরকার ছিল। তাকে নিয়ে এ যাত্রা বিশেষ মাতামাতি করা যাবে না সেটাও জানিয়ে দিয়েছি। ক্ষেত্র নিজে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট কৌতুহলী ও ওয়াকিবহাল। হোটেলের ঘরে বসে বিশেষ করে তাঁর জন্য সামান্য ডেমনষ্ট্রেশন দিতে নকুড়বাবুর নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না।

আমার আসন্ন বিপদের কথটা সত্যি কি মিথ্যে জান না । আমার বলে-বলে
একটা সন্দেহ হচ্ছে যে, নকুড়বাবু নির্খরচায় বিদেশ দেখার লোভটা সামলাতে
পারেননি । আমি লিখেছি তিনি যেন রওনা হ্বার অস্তত তিনি দিন আগে আমার
কাছে চলে আসেন । তাঁর আদবকায়দার দৌড় কতটা সেটা একবার দেখে নেওয়া
দরকার । ভাষা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই । ইংরিজিটা মনে হয় ভদ্রলোক
একরকম নিজেই চালিয়ে নিতে পারবেন ; আর, কোনো বিশেষ অবস্থায় যদি
ব্রেজিলের ভাষা পর্তুগীজ বলার প্রয়োজন হয়, তার জন্য তো আমিই আছি ।
ভারতবর্ষের ইতিহাসে পর্তুগীজদের ভূমিকার কথা মনে করে আমি এগারো বছর
বয়সে গিরিডির পর্তুগীজ পাদরি ফাদার রেবেলোর কাছ থেকে ভাষাটা শিখে
নিয়েছিলাম ।

২৩০ অক্টোবর

আজ নকুড়বাবু এসেছেন। এই ক'মাসে ভদ্রলোকের চেহারার যেন প্রভাব উন্নতি লক্ষ করছি। বললেন যোগব্যায়ামের ফল। ইতিমধ্যে কলকাতায় গিয়ে ভদ্রলোক দুটো সুট করিয়ে এনেছেন, সেই সঙ্গে শাট-টাই-জুতো-মোজা ইত্যাদি ও জোগাড় হয়েছে। দাঁতনের অভ্যাস বলে টুথপেস্ট টুথব্রাশ কিনতে হয়েছে। সুটকেস যেটা এনেছেন সেটা নাকি আসলে উকিল শিবরতন মল্লিকের। সেটি যে এনার কাছে কী করে এল সেটা আর জিগোস করলাম না।

“ବ୍ରେଜିନେର ଜଙ୍ଗଳ ଦେଖିତେ ଯାବେନ ନା ?” ଆଜ ଦୁପୁରେ ଖାବାର ସମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଲେଣ ଭଦ୍ରଲୋକ । ଆମି ବଲଲାମ, “ସାତ ଦିନ ତୋ ଘୁରିଯେ ଦେଖାବେ ବଲେଛେ ; ତାର ମଧ୍ୟେ ଅରଣ୍ୟ କି ଆର ଏକେବାରେ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ?”

ନକୁଡ଼ିବାବୁ ବଲଲେନ, “ଆମାଦେର ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ଲାଇବ୍ରେରିତେ ଖୋଜ କରେ ବରଦା ବୌଡ଼ୁଜ୍ୟେର ଲେଖା ଛବିଟିବି ଦେଓୟା ଏକଟା ପୂରାନୋ ବହି ପେଲାମ ବ୍ରେଜିଲ ସମ୍ବନ୍ଧେ । ତାତେ ଲିଖେଛେ ଓଥାନକାର ଜଙ୍ଗଲେର କଥା, ଆର ଲିଖେଛେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲେ ଏକରକମ ସାପ ଆହେ ଯା ନାକି ଲସ୍ବାୟ ଆମାଦେର ଅଜଗରେର ଡବଳ ।”

মোট কথা ভদ্রলোক বেশ খোশমেজাজে আছেন। এখনো পর্যন্ত কোনো নতুন ক্ষমতার পরিচয় দেননি। সত্তি বলতে কী, সে-প্রসঙ্গ আর উথাপনই করেননি।

ক্রোল ও সন্তার্স দু'জনেই সাও পাউলো যাচ্ছে বলে লিখেছে। বলা বাহ্য

দু'জনেই নকুড়বাবুকে দেখার জন্য উদগীব হয়ে আছে

১০ই অক্টোবর, সাও পাউলো, রাত সাড়ে এগারোটা

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে, কনফারেন্সের কর্ণধার প্রোফেসর রডরিগোজের বাড়িতে ডিনার খেয়ে আধ ঘণ্টা হল ফিরেছি হোটেলে। শহরের প্রাণ্টে সমুদ্রের ধারে পথবীর বহু বিখ্যাত হোটেলকে হার মানানো এই গ্র্যান্ড হোটেল। আমন্ত্রিতার সকলেই এখানে উঠেছেন। আমাকে দেওয়া হয়েছে একটি বিশাল সুসজ্জিত ‘সুইট’—নম্বর ৭৭। আমার সেক্রেটারি নকুড় বিশ্বাস একই তলায় আছেন ১১২ নং সিঙ্গল রুমে।

এখানকার কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে ক্রোল ও সভাসও গিয়েছিল এয়ারপোর্টে
আমাকে রিসীভ করতে। সেখানেই নকুড়বাবুর সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দিই।
ক্রোলের সঙ্গে পরিচয় হতেই নকুড়বাবু জার্মান ভদ্রলোকটির দিকে কয়েক মুহূর্ত
চেয়ে থেকে বললেন, “আলপস—বাভারিয়ান আলপস—নাইন্টিন থার্টি টু—ইউ
অ্যান্ড টু ইয়ং মেন ক্লাইমবিং, ক্লাইমবিং, ক্লাইমবিং—দেন স্লিপিং, স্লিপিং,
স্লিপিং—দেন—উফফ—ভেরি ব্যাড !”

କ୍ରୋଳ ଦେଖି ମୁଁ ହାଁ କରେ ସମ୍ମୋହିତେର ମତୋ ଚେଯେ ଆଛେ ନକୁଡ଼ିବାବୁର ଦିକେ । ତାରପର ଆର ଥାକତେ ନା ପେରେ ଜାର୍ମାନ ଭାଷାତେଇ ଚେଟିଯେ ଉଠିଲ—“ଆମାର ପାହଡକେ ଗିଯେଛିଲ । ଆମାକେ ବାଁଚାତେ ଗିଯେ ହାରମ୍ୟାନ ଓ କାର୍ଲ ଦୁ’ଜନେରଇ ଥାଣ୍ୟ !”

କଥାଟା ବାଂଲାୟ ଅନୁବାଦ କରେ ଦିତେ ନକ୍ଷତ୍ରବ୍ୟୁଷ ବାଂଲାୟ ବଲଲେନ, “ଦୃଶ୍ୟାଟା ଭେସେ ଉଠିଲ ଚୋଖେର ସାମନେ । ବଲତେ ଚାଇନୀ । ବଡ଼ ମହାନ୍ତିକ ଘଟନା ଓର ଜୀବନେବ ।”

বলা বাহ্যিক, ক্রোলকে আমার আর মুখে কিছু বলতে হয়নি। আমি জানি সন্তাস এ-ধরনের ক্ষমতা সম্পর্কে বেশ খানিকটা সন্দেহ পোষণ করে। সে প্রথমে কোনো মন্তব্য করেনি; এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার পথে গাড়িতে আমার পাশে বসে একবার শুধু জিগ্যেস করল, “ক্রোলের যুবা বয়সের এ-ঘটনাটা তুমি জানতে ?”

আমি যাথা গ্রেডে “না” বললাম।

এর পরে আব এ নিয়ে কোনো কথা হ্যনি

আজ ডিনারে প্রোঃ রডরিগেজের সেক্রেটারি মিঃ লোবোর সঙ্গে আলাপ হল। এখনকার অনেকেই গায়ের রং যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, আর চোখের মণি এবং মাথার ছুল কালো। মিঃ লোবোও এর ব্যতিক্রম নন। বেশ চালাক-চতুর ভদ্রলোক। ইংরিজিটাও মোটামুটি ভালো জানেন, ঘটাখানেকের আলাপেই



আমাদের সঙ্গে বেশ মিশে গেছেন। তাঁকে বললাম যে, আমাদের খুব ইচ্ছে কল্পনারের পর ব্রেজিলের জঙ্গলের কিছুটা অংশ ঘুরে দেখা। “নিশ্চয়, নিশ্চয়!” বললেন মিঃ লোবো, যদিও বলার চাঁড়ে কোথায় যেন একটা কৃত্রিমতার আভাস পেলাম। আসলে এরা হয়ত চাইছেন অতিথিদের ব্রেজিলের আধুনিক সভ্যতার নির্দর্শনগুলি দেখাতে।

আজ আলোচনা-সভায় আমি ইংরিজিতে বক্তৃতা করেছিলাম। আমার সেক্রেটারি সে-বক্তৃতার সম্পর্কটাই শর্টহ্যান্ডে লিখে রেখেছেন। আমি জানি আজকের দিনে টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে বক্তৃতা তুলে রাখাটাই সবচেয়ে সহজ ও নির্ভরযোগ্য উপায় ; কিন্তু নকুড়বাবু এত কষ্ট করে পিটম্যান শিখে এসেছেন, তাই মনে হল তাঁকে সেটার সম্মানণার করতে দেওয়াটাই ভাল।

আমার আবিষ্কার ও সেই সংক্রান্ত গবেষণার কাগজপত্রের প্রদর্শনিও আজই খুলল। যে-সব জিনিস এতকাল গিরিভিতে লোকচক্ষুর অস্তরালে আমার আলমারির মধ্যে পড়ে ছিল, সেগুলো হঠাতে আজ পৃথিবীর বিপরীত গোলাধৰে

ব্রেজিলের শহরের প্রকাশ্য প্রদর্শনিতে দেখতে কেমন যেন আন্তুত লাগছিল। সত্যি বলতে কী, একটু যে ভয়ও করছিল না তা নয়, যদিও ব্রেজিল সরকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন ভালই। প্রদর্শনীর দরজার বাইরে এবং রাটানটান ইনসিটিউটের ফটকে সশন্ত পুলিশ। কাজেই ভয়ের কারণ নেই।

১২ই অক্টোবর, সকাল সাড়ে ছাটা

গতকাল বেশ কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেল।

কাল লাঞ্ছের পর আমি আমার দুই বিদেশী বন্ধু ও সেক্রেটারি সমেত শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম। কিছু কেনাকাটা সেরে বিকেলে হোটেলে ফিরে নকুড়বাবু তাঁর ঘরে চলে গেলেন। এটা লক্ষ করছি যে, ঠিক যতটুকু সময় আমার সঙ্গে না থাকলে নয়, তার এক মিনিটও বেশি থাকেন না ভদ্রলোক। ক্রোল আর সন্দার্শও আমার ঘরে বসে কফি খেয়ে যে যার ঘরে চলে গেল; কথা হল স্নান করে এক ঘণ্টার মধ্যে হোটেলের লবিতে জমায়েত হয়ে একসঙ্গে যাব এখানকার এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে।

ব্রেজিলের কফির তুলনা নেই, তাই আমি নিজের জন্যে সবে আর-এক পেয়ালা ঢেলেছি, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। হ্যালো বলাতে উলটো দিক থেকে বাজখাই গলায় প্রশ্ন এল—

“ইজ দ্যাট প্রোফেসর শ্যাঙ্কু ?”

আমি জানালাম আমিই সেই ব্যক্তি।

“দিস ইজ সলোমন ব্লুমগার্টেন !”

নামটা মনে পড়ে গেল। ইনিই গিরিভিতে চিঠি লিখে আমার তিনটে আবিষ্কারের পেটেন্ট স্বত্ত্ব কেনার প্রস্তাব করেছিলেন।

“চিনতে পেরেছ আমাকে ?” প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

“বিলক্ষণ !”

“একবার আসতে পারি কি ? আমি এই হোটেলের লবি থেকেই ফোন করছি।”

আমার মুশকিল হচ্ছে কী, এসব অবস্থায় সরাসরি কিছুতেই না বলতে পারি না, যদিও জানি এর সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ নেই। অগত্যা ভদ্রলোককে আসতেই বলতে হল।

মিনিট তিনিক পরে যিনি আমার ঘরে প্রবেশ করলেন, ঠিক তেমন একজন মানুষকে আর কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ভাণ্যে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই ঘরে ; থাকলে সব দিক দিয়েই প্রমাণ সাইজের প্রায় দেড় এই মানুষটির পাশে আমার মতো একজন মিনি-মানুষকে দেখে তিনি কখনই হাসি সংবরণ

করতে পারতেন না ।

দাঁড়ানো অবস্থায় এনার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব, তাই কর্মদণ্ডের ঠেলা কোনোমতে সামলে বললাম, “বসুন, মিঃ ব্লুমগার্টেন !”
“কল মি সল !”

চোখের সামনে থেকে পাহাড় সরে গেল । ভদ্রলোক আসন গ্রহণ করেছেন ।
“কল মি সল,” আবার বললেন ভদ্রলোক, “অ্যান্ড আইল কল ইউ শ্যাঙ্ক, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড !”

সল অ্যান্ড শ্যাঙ্ক । সলোমন ও শঙ্কু । এত চট-সোহার্দের প্রয়োজন কী জানি না, তবে এটা জানি যে এ-ধরনের প্রস্তাবে “হ্যাঁ” বলা ছাড়া গতি নেই । বললাম,
“বলো, সল, কী করতে পারি তোমার জন্য ।”

“তোমাকে তো বলেইছি চিঠিতে । সেই একই প্রস্তাব আবার করতে এসেছি আমি । আজ তোমার প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম । কিছু মনে কোরো মনে হয় তুমি আবিক্ষারগুলোর ব্যবসার কাছে গোপন রেখে তুমি অত্যন্ত স্বার্থপূর্ণ কাজ করেছ ।”

দানবাকৃতি মানুষটি বসে পড়াতে আমার স্বাভাবিক মনের জোর অনেকটা ফিরে এসেছে । বললাম, “তুমি কি মানব-কল্যাণের জন্য এতই ব্যগ্র ? আমার তো মনে হয় তুমি আবিক্ষারগুলোর ব্যবসার দিকটাই দেখছ, তাই নয় কি ?”

মুহূর্তের জন্য সলোমন ব্লুমগার্টেনের লোশন ভুঁক দুটো নিচে নেমে এসে চোখ দুটোকে প্রায় ঢেকে ফেলে আবার তখনই যথাস্থানে ফিরে গেল ।

“আমি ব্যবসায়ী, শ্যাঙ্ক, তাই ব্যবসার দিকটা দেখব তাতে আশর্মের কী ? কিন্তু তোমাকে বঞ্চিত করে তো নয় ! তোমাকে আমি এক লাখ ডলার দিতে প্রস্তুত আছি ওই তিনিটি আবিক্ষারের স্বত্ত্বের জন্য । চেক-বই আমার সঙ্গে আছে । নগদ টাকা চাও, তাও দিতে পারি—তবে এতগুলো টাকা সঙ্গে নিয়ে তোমারই অসুবিধা হবে ।”

আমি মাথা নাড়লাম । চিঠিতে যে-কথা বলেছিলাম, সেটাই আবার বললাম যে, আমার এই জিনিসগুলো কোনোটাই মেশিনের সাহায্যে কারখানায় তৈরি করা সম্ভব নয় ।

গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে ব্লুমগার্টেন চেয়ে রাইলেন বেশ কিছুক্ষণ স্টান আমার দিকে । তারপর গুরুগত্ত্বাত্মক স্বরে বললেন চারটি ইংরিজি শব্দ ।

“আই ডোন্ট বিলীভ ইউ !”

“তাহলে আর কী করা যায় বলো !”

“আই ক্যান ডাবল মাই প্রাইস, শ্যাঙ্ক !”

কী মুশকিল ! লোকটাকে কী করে রোাবাই যে, আমি দিব্যি আছি, আমার আর

নকুড়বাবু ও এল ডোরাডো

টাকার দরকার নেই, এক লক্ষের জায়গায় বিশ লাখ পেলেও আমি ঘৃত্ত বিক্রি করব না ।

ভদ্রলোক কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল ।
উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি আমার স্কেক্টেরি ।

“ইয়ে—” ভারী কিন্তু-কিন্তু ভাব করে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে এলেন । “কাল সকালের প্রোগ্রামটা— ?”

এইটুকু বলে ব্লুমগার্টেনের দিকে চোখ পড়াতে নকুড়বাবু হঠাৎ কথার খেই হারিয়ে ফেললেন ।

ভারী অশ্঵স্তিক পরিস্থিতি । ব্লুমগার্টেনকে হঠাৎ দেখলে অনেকেরই কথার খেই হারিয়ে যেতে পারে । কিন্তু নকুড়বাবু যেন শুধু হারাননি ; সেই সঙ্গে কিছু যেন পেয়েওছেন তিনি ।

“কালকের প্রোগ্রামের কথা জানতে চাইছিলেন কি ?”

পরিস্থিতিটাকে একটু সহজ করার জন্য প্রশ্নটা করলাম আমি ।

পশ্চের উভরে যে-কথাটা নকুড়বাবুর মুখ দিয়ে বেরোল সেটা বর্তমান ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক । ব্লুমগার্টেনের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই ভদ্রলোক মৃদু স্বরে দুবার ‘এল ডোরাডো’ কথাটা উচ্চারণ করে কেমন যেন হতভবিতাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ।

“হ ওয়াজ দ্যাট ম্যান ?”

আমি দরজা বন্ধ করার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রশ্নটা করলেন সলোমন ব্লুমগার্টেন ।

আমি বললাম, “আমার স্কেক্টেরি ।”

“এল ডোরাডো কথাটা বলল কেন হঠাৎ ?”

ব্লুমগার্টেনের ধীধালো ভাবটা আমার কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে ।
বললাম, “দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে পড়াশুনা করছেন ভদ্রলোক, কাজেই এল ডোরাডো নামটা জানা কিছুই আশর্য নয় ।”

সোনার শহর এল ডোরাডোর কিংবদন্তীর কথা কে না জানে ? বোড়শ শতাব্দীতে স্পেন থেকে কোর্টেজের সৈন্য দক্ষিণ আমেরিকায় এসে স্থানীয় অধিবাসীদের যুদ্ধে হারিয়ে এদেশে স্পেনের আধিপত্য বিস্তার করে । তখনই এখনকার উপজাতিদের মুখে এল ডোরাডোর কথা শোনে স্পেনীয়রা, আর তখন থেকেই এ নাম চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে ধনলিঙ্গ পর্যটকদের । ইংল্যান্ডের স্যার ওয়ল্টার র্যালে পর্যটন এল ডোরাডোর টানে নৌবহর নিয়ে হাজির হয়েছিলেন এই দেশে । কিন্তু এল ডোরাডো চিরকালই অব্বেষণকারীদের ফাঁকি দিয়ে এসেছে । পেরু বোলিভিয়া কোলোম্বিয়া ব্রেজিল আর্জেন্টিনা—দক্ষিণ আমেরিকার কোনো দেশেই এল ডোরাডোর কোনো সন্ধান মেলেনি ।

ব্লুমগার্টেন হতবাক হয়ে টেবিল ল্যাম্পের দিকে চেয়ে রয়েছে দেখে আমি বাধ্য হয়েই বললাম, “আমাকে বেরোতে হবে একটু পরেই ; কাজেই তোমার যদি আর কিছু বলার না থাকে তাহলে—”

“ভারতীয়রা তো জাদু জানে ?” আমার কথা চাপা দিয়ে প্রশ্ন করল ব্লুমগার্টেন।

আমি হেসে বললাম, “তাই যদি হত, তাহলে ভারতে এত দারিদ্র্য থাকত কি ? জাদু জানলেও নিজেদের অবস্থার উন্নতি করার জাদু তারা নিশ্চয়ই জানে না।”

“সে তো তোমাকে দিয়েই বুঝতে পারছি,” ব্যঙ্গের সুরে বলল ব্লুমগার্টেন, “যে-দেশের লোক টাকা হাতে তুলে দিলেও সে-টাকা নেয় না, সে-দেশ গরিব থাকতে বাধ্য। কিন্তু...”

ব্লুমগার্টেন আবার চুপ, আবার অন্যমনন্ত। আমার আবার অসহায় ভাব ; এ লোকটাকে তাড়ানোর রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না।

“জাদুর কথা বলছি এই কারণে,” বলল ব্লুমগার্টেন, “আমার যে-মুহূর্তে এল ডোরাডের কথাটা মনে হয়েছে, সেই মুহূর্তে নামটা কানে এল ওই ভদ্রলোকের মুখ থেকে। আজ থেকে দুশো বছর আগে আমার পূর্বপুরুষরা পর-পর তিন পুরুষ ধরে উত্তর আমেরিকা থেকে এদেশে পাড়ি দিয়েছে এল ডোরাডের সন্ধানে। আমি নিজে দুবার এসেছি যুবা-বয়সে। পেরু, বেলিভিয়া, গুইয়ানা, ইকুয়েডর, ভেনিজুয়েলা—কোনো দেশে খোঁজা বাদ দিইনি। শেষে ব্রেজিলে এসে জঙ্গলে ঘুরে ব্যারাম বাধিয়ে বাধ্য হয়ে এল ডোরাডের মায়া ত্যাগ করে দেশে ফিরে যাই। আজ এতদিন পরে আবার ব্রেজিলে এসে কাল থেকে মাঝে-মাঝে এল ডোরাডের কথাটা মনে পড়ে যাচ্ছে, আর আজ...”

আমি কোনো মন্তব্য করলাম না। ব্লুমগার্টেনও উঠে পড়ল। বলল, “আমি ম্যারিনা হোটেলে আছি। যদি মত পরিবর্তন করো তো আমাকে জানিও।”

ক্রোল আর সভার্সকে ঘটনাটা বলতে তারা দুজনেই রেগে আগুন। সভার্স বলল, “তুমি অতিরিক্ত রকম ভদ্র, তাই এইসব লোকের ঔদ্ধত্য হজম করো। এবার এলে আমাদের একটা ফোন করে দিও, আমরা এসে যা করার করব।”

এর পরের ঘটনাটা ঘটল মাঝেরাত্তিরে। পরে ঘড়ি দেখে জেনেছিলাম তখন সোয়া দুটো। ঘুম ভাঙল কলিং বেলের শব্দে। বিদেশ-বিভুইয়ে এত রাত্তিরে আমার ঘরে কে আসতে পারে ?

দরজা খুলে দেখি শ্রীমান নকুড় বিশ্বাস। ফ্যাকাশে মুখ, ত্রস্ত ভাব।

“অপরাধ নেবেন না তিলুবাবু, কিন্তু না এসে পারলাম না।”

ভদ্রলোকের চেহারাটা ভাল লাগছিল না, তাই বললাম, “আগে বসুন, তারপর কথা হবে।”

সোফায় বসেই নকুড়বাবু বললেন, “কপি হয়ে গেল।”

কপি ? কিসের কপি ? এত রাত্তিরে এসব কী বলতে এসেছেন ভদ্রলোক ? “যন্ত্রটার নাম জানি না,” বলে চললেন নকুড়বাবু, “তবে চোখের সামনে দেখতে পেলাম। একটা বাক্সের মতো জিনিস, ভিতরে আলো জ্বলছে, ওপরে একটা কাঁচ। একটা কাগজ পুরে দেওয়া হল যন্ত্রে ; তারপর একটা হাতল ঘোরাতেই কাগজের লেখা অন্য একটা কাগজে হ্রবহ নকল হয়ে বেরিয়ে এল।”

শুনে মনে হল ভদ্রলোক জীরক্স ডুপলিকেটিং যন্ত্রের কথা বলছেন।

“কী কাগজ ছাপা হল ?” প্রশ্ন করলাম আমি।

নকুড়বাবুর দ্রুত নিষ্পাস পড়ছে। একটা আতঙ্কের ভাব দেখা দিয়েছে মুখে। “কী ছাপা হল ?” আবার জিগ্যেস করলাম।

নকুড়বাবু এবার মুখ তুলে চাইলেন আমার দিকে। সংশয়কুল দৃষ্টি।

“আপনার আবিষ্কারের সব ফরমুলা,” চাপা গলায় দৃষ্টি বিস্ফারিত করে বললেন নকুড়বাবু।

আমি না-হেসে পারলাম না।

“আপনি এই বলতে এসেছেন এত রাত্তিরে ? আমার ফরমুলা প্রদর্শনির ঘর থেকে বেরোবে কী করে ? সে তো—”

“ব্যাক থেকে টাকা চুরি হয় না ? দলিল চুরি হয় না ?” প্রায় ধমকের সুরে বললেন নকুড়বাবু। “আর ইনি যে ঘরের লোক। ঘরের লোককে পুলিশই বা আটকাবে কেন ?”

“ঘরের লোক ?”

“ঘরের লোক, তিলুবাবু। মিস্টার লোবো !”

আমার মনে হল ভয়ঙ্কর আবোল-তাবোল বকছেন নকুড়বাবু। বললাম, “এসব কি আপনি স্বপ্নে দেখলেন ?”

“স্বপ্ন নয় !” গলার স্বর তিন ধাপ চড়িয়ে বললেন নকুড়বাবু। “চোখের সামনে জলজ্যান্ত দেখতে পেলাম এই দশ মিনিট আগে। হাতে টর্চ নিয়ে চুকলেন মিঃ লোবো—নিজে চাবি দিয়ে প্রদর্শনীর ঘরের দরজা খুলে। প্রহরী চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে। লোবো সোজা চলে গেলেন একটা বিশেষ টেবিলের দিকে—যেটাৰ কাঁচের ঢাকনার তলায় আপনার খাতাপত্তর রয়েছে। ঢাকনা তুলে দুটো খাতা বার করলেন মিঃ লোবো। তারপর অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটা প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সিডি দিয়ে উঠে উপরের তলার একটা আপিসঘরে গিয়ে চুকলেন। সেইখানে রয়েছে এই যন্ত্রে কী নাম এই যন্ত্রে তিলুবাবু ?”

“জীরক্স,” যথাসম্ভব শাস্ত স্বরে বললাম আমি। কেন জানি নকুড়বাবুর কথাটা আর অবিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু মিঃ লোবো !

“আপনার ঘুমের ব্যাঘাত কৰার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত, তিলুবাবু,” আবার সেই খুব চেনা কৃষ্ণার ভাব করে বললেন নকুড় বিশ্বাস, “কিন্তু খবরটা আপনাকে না-দিয়ে পারলাম না। অবিশ্যি আমি যখন রয়েছি, তখন আপনার যাতে ক্ষতি না হয় তার যথাসাধ্য চেষ্টা কৰব। যেটা ঘটতে যাচ্ছে সেটা আগে থাকতে জানতে পারলে একটা মন্ত সুবিধে তো! আসলে নতুন জায়গায় এসে মনটাকে ঠিক সহজ কৰতে পারছিলাম না, তাই লোভোবাবুর ঘটনাটা আগে থেকে জানতে পারিনি—কেবল বুৰোছিলাম আপনার একটা বিপদ হবে সাও পাউলোতে।”

নকুড়বাবু আবার ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, আৰ আমিও চিন্তিতভাৱে এসে বিছানায় শুলাম।

আমাৰ মধ্যে নকুড়বাবুৰ মতো অতিপ্ৰাকৃত ক্ষমতা না-থাকলেও এটা বেশ বুৰাতে পাৰছি যে লোভোৰ মতো লোকেৰ পক্ষে নিজে থেকে এ-জিনিস কৰা সম্ভব নয়। তাৰ পিছনে অন্য লোক আছে। পয়সাওয়ালা লোক।

ভাবলে একজনেৰ কথাই মনে হয়।

সলোমন ব্লুমগার্টেন।

১২ই অক্টোবৰ, রাত পৌনে বারোটা

আজ রাটানটান ইনসিটিউট থেকে আমাকে ডক্টৰেট দেওয়া হল। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান, প্ৰোঃ রড়িগেজ-কে নিয়ে চারজন বিভিন্ন দেশৰ বৈজ্ঞানিকেৰ আন্তৰিকতাপূৰ্ণ ভাষণ, ও সবশেষে আমাৰ ধন্যবাদজ্ঞাপন। সব মিলিয়ে মনটা ভাৰী প্ৰসন্ন হয়ে উঠেছিল। আজ ডিনারে আমাৰ দুই বন্ধু ও প্ৰোঃ রড়িগেজেৰ উপৰোক্ষে জীবনে প্ৰথম এক চুমুক শ্যাম্পেন পান কৰলাম। এটাও একটা ঘটনা বটে।

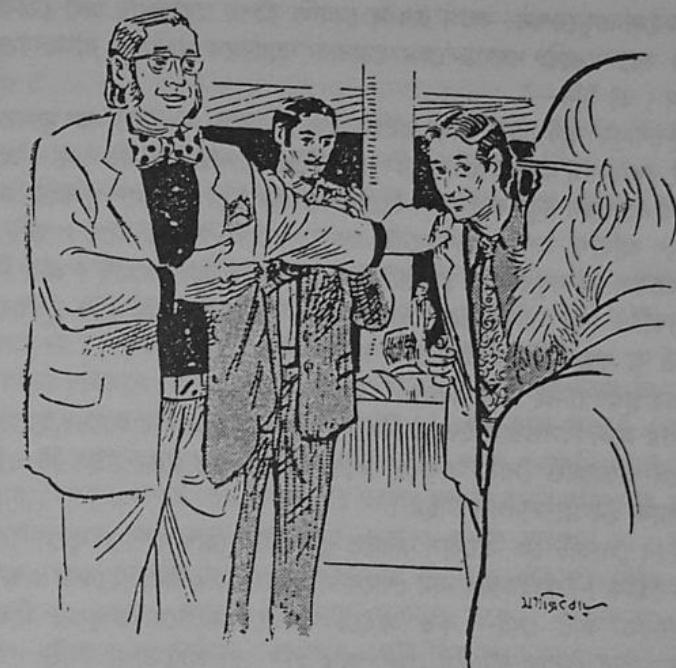
কাল নকুড়বাবুৰ মুখে মিঃ লোভোৰ বিষয় শুনে মনটা বিষয়ে গিয়েছিল, আজ ভদ্ৰলোকেৰ অমাৰিক ব্যবহাৰে মনে হচ্ছে নকুড়বাবু হয়ত এবাৰ একটু ভুল কৰেছেন। প্ৰদশনীতে তুঁ মেৰে দেখে এসেছি যে, আমাৰ কাগজপত্ৰ ঠিক যেমন ছিল তেমনই আছে।

হোটেলে ফিরতে-ফিরতে হল এগারোটা। চুকেই একটা দৃশ্য দেখে একেবাৰে হকচকিয়ে যেতে হল।

হোটেলেৰ লবিতে চতুর্দিকেই বসাৰ জন্য সোফা ছড়ানো রয়েছে; তাৰই একটায় দেখি একপাশে বিশালবপু সলোমন ব্লুমগার্টেন ও অন্যপাশে একটি অচেনা বিদেশী ভদ্ৰলোককে নিয়ে বসে আছেন আমাৰ সেক্রেটাৰি শ্ৰীনকুড়চন্দ্ৰ বিশ্বাস।

আমাৰ সঙ্গে চোখাচুখি হতেই নকুড়বাবু একগাল হেসে উঠে এলেন।

নকুড়বাবু ও এল ডোৱাড়ো



মার্কিন্যাদ

“এনাদেৰ সঙ্গে একটু বাক্যালাপ কৰছিলাম।”

ব্লুমগার্টেনও উঠে এলেন।

“কন্ট্ৰ্যাচুলেশনস।”

কৰমদনে যথারীতি হাতব্যথা কৰিয়ে দিয়ে ব্লুমগার্টেন চোখ কপালে তুলে বললেন, “তুমি কাকে সেক্রেটাৰি কৰে নিয়ে এসেছ? ইনি তো অসাধাৰণ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি! আমাৰ চোখেৰ দিকে চেয়ে আমাৰ নাড়ীনক্ষত্ৰ বলে দিলেন।”

দু'জনেৰ মধ্যে মোলাকাতটা কীভাৱে হল সেটা ভাবছি, তাৰ উত্তৰ নকুড়বাবুই দিয়ে দিলেন।

“আমাৰ বন্ধু যোগেন বকশীৰ ছেলে কানাইলালকে একটা পোস্টকাৰ্ড লিখে পোস্ট কৰাৰ জন্য ওই কাউন্টাৰে দিতে গিয়ে দেখি এনারা পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমাৰ দেখে ব্লুমগার্টেন সাহেবেই এগিয়ে এসে আলাপ কৰলেন। বললেন কাল আমাৰ মুখে এল ডোৱাড়োৰ নাম শুনে ওঁৰ কৌতুহল হচ্ছে আমি এল ডোৱাড়ো সম্পর্কে কতদূৰ জানি। আমি বললুম—আই আ্যাম মুখ্যসুখ্য

ম্যান—নো এডুকেশন—কাল একটা বেঙ্গলি বইয়ে পড়ছিলাম এল ডোরাডোর কথা। তা, পড়তে পড়তে যেন সোনার শহরটাকে চোখের সামনে দেখতে পেলাম। তা ইনি—”

নকুড়বাবুর বাক্যশ্রেত বন্ধ করতে হল। ক্রেল ও সন্দর্ভের মুখের ভাব দেখেই বুঝছিলাম তাদের প্রচণ্ড কোতৃহল হচ্ছে ব্যাপারটা জানার জন্য। আমি এ পর্যন্ত যা বলেছেন নকুড়বাবু সেটা ইংরেজি তর্জমা করে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলাম। ততক্ষণে অবিশ্য আমরা তিনজনেই একটা পাশের সোফায় বসে পড়েছি, এবং আমি আমার দুই বন্ধুর সঙ্গে ব্লুমগার্টেনের আলাপ করিয়ে দিয়েছি। অন্য বিদেশী ভদ্রলোকটির নাম নাকি মাইক হ্যাচেট। হাবভাবে বুকলাম ইনি ব্লুমগার্টেনের বড়গার্ড বা ধামাধারী গোছের কেউ।

এবার ব্লুমগার্টেনই কথা বলল।

“ইওর ম্যান বিসওয়াস ইজ এ রিয়্যাল উইজার্ড। ওকে মাইরনের হাতে তুলে দিলে সে রাতারাতি সোনা ফলিয়ে দেবে, অ্যান্ড ইওর ম্যান উইল বি ওনিং এ ক্যাডিল্যাক ইন থ্রি মানথস টাইম !”

মাইরন লোকটি কে জিগ্যেস করাতে ব্লুমগার্টেন চোখ কপালে তুলে বললেন, “হোলি শ্রোক !—মাইরনের নাম শোনোনি ? মাইরন এন্টারপ্রাইজেজ ! অত বড় ইমপ্রেসারিও আর নেই। কত গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে জাদুকর মাইরনের ম্যানেজমেন্টের জোরে দাঁড়িয়ে গেল, আর ইনি তো প্রতিভাধর ব্যক্তি।”

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। নকুড়বাবু শেষটায় রঙমধ্যে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে নাম কিনবেন ? কই, এমন তো কথা ছিল না !

“অ্যান্ড হি নোজ হোয়ায়ার এল ডোরাডো ইজ !”

আমি নকুড়বাবুর দিকে দৃষ্টি দিলাম। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। বললাম, “কী মশাই, আপনি কি সাহেবকে বলেছেন এল ডোরাডো কোথায় তা আপনি জানেন ?”

“যেটুকু আমি জানি সেটুকুই বলেছি,” কাঠগড়ার আসামির মতো হাত জোড় করে বললেন নকুড় বিশ্বাস। “বলেছি এই ব্রেজিলেই আছে এল ডোরাডো। আমরা যেখানে আছি তার উত্তর-পশ্চিমে। একটি পাহাড়ে যেরা উপত্যকার ঠিক মধ্যখানে এক গভীর জঙ্গল, সেই জঙ্গলের মধ্যেই এই শহর। কেউ জানে না এ শহরের কথা। মানুষজন বলতে আর কেউ নেই সেখানে। পোড়ো শহর, তবে রোদ পড়লে এখনো সোনা বলমল করে। সোনার তোরণ, সোনার পিরামিড, যেখানে-সেখানে সোনার স্তুপ, বাড়ির দরজা-জানালা সব সোনার। সোনা তো আর নষ্ট হয় না, তাই সে-সোনা এখনো আছে। লোকজন যা ছিল, হাজার বছর আগে সব লোপ পেয়ে যায়। একবার খুব বর্ষা হয় ; তার পরেই জঙ্গলে এক

মারাঞ্চক পোকা দেখা দেয় ; সেই পোকা থেকেই মড়ক। বিশ্বাস করুন তিলুবাবু, এ সবই আমি পর পর চোখের সামনে বায়োক্ষেপের ছবির মতো দেখতে পেলুম।”

ক্রেল ও সন্দর্ভের জন্য এই অংশটুকু ইংরিজিতে অনুবাদ করে দিয়ে ব্লুমগার্টেনকে বললাম, “তুমি তো তাহলে এল ডোরাডোর হাদিস পেয়ে গেলে ; এবার অভিযানের তোড়জোড় করো। আমরা আপাতত ক্লান্ট, কাজেই আমাদের মাপ করো।—আসুন নকুড়বাবু !”

আমার কথায় ব্লুমগার্টেনের মুখে যে থমথমে ভাবটা দেখা দিল, সেটা যে-কোনো লোকের মনে ত্রাসের সংগ্রাম করত। আমি সেটা যেন দেখেও দেখলাম না। নকুড়বাবু উঠে এলেন ভদ্রলোকের পাশ ছেড়ে।

আমরা চারজনে গিয়ে বসলাম আমার ঘরে। নকুড়বাবুর ইচ্ছে ছিল সোজা নিজের ঘরে চলে যান, কিন্তু আমি বললাম যে, তাঁর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। দুই সাহেবে বন্ধুর কাছে বাংলা বলার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে নকুড়বাবুকে বললাম, “দেখুন, মশাই, আমি আপনার ভাল জন্যই বলছি, আপনার মধ্যে যে ক্ষমতাটা আছে সেটা যার-তার কাছে এভাবে প্রকাশ করবেন না। আপনার অভিজ্ঞতা কম, আপনি হয়ত লোক চেনেন না, কিন্তু এটা বলে দিচ্ছি যে, এই ব্লুমগার্টেনের খপ্পরে পড়লে আপনার সর্বনাশ হবে। আপনাকে অনুরোধ করছি—আমাকে না-জানিয়ে ফস করে একটা কিছু করে বসবেন না।”

নকুড়বাবু উঠে পড়লেন। ভদ্রলোক চলে যাবার পর ক্রেল তার পাইপে টান দিয়ে এক ঘর ধোঁয়া ছেড়ে বলল, “এল ডোরাডো যদি সতিই থেকে থাকে, তাহলে সেটা আমাদের একবার দেখে আসা উচিত নয় কি ?”

আগেই বলেছি, সন্দর্ভ এসব ব্যাপারে ঘোর সন্দেহবাদী। সে ধর্মকের সুরে বলল, “দেখ হে জার্মান পশ্চিম, তিন শো বছর ধরে সোনার-স্বপ্নদেখা অজস্র লোক দক্ষিণ আমেরিকা চেয়ে বেড়িয়েও এল ডোরাডোর সন্ধান পায়নি, আর এই ভদ্রলোকের এই কটা কথায় তুমি মেতে উঠলে ? ওই অতিকায় ইহুদী যদি এসব কথায় বিশ্বাস করে জঙ্গলে গিয়ে জাগুয়ারের শিকার হতে চান, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমি এর মধ্যে নেই। আমাদের যা প্ল্যান হয়েছে তার একচুল এদিক-ওদিক হয় এটা আমি চাই না। আমার বিশ্বাস শঙ্খও এ-বিষয়ে

আমার সঙ্গে একমত ।”

আমি মাথা নেড়ে সন্দৰ্শের কথায় সায় দিলাম। আমাদের প্ল্যান হল আমরা
কাল সকালে ব্রেকফাস্টের পর প্লেনে করে চলে যাব উত্তরে, ব্রেজিলের রাজধানী
ব্রাসিলিয়া শহরে। সেখানে একদিন থেকে ছেট প্লেন ধরে আমরা চলে যাব জিন্সু
ন্যাশনাল পার্কের উত্তর প্রান্তে পোস্টো ডিয়াউয়ারম শহরে। তারপর বাকি অংশ
নদীপথে। জিন্সু নদী ধরে নৌকা করে আমরা যাব পোরোরি গ্রামে। পোরোরিতে
ব্রেজিলের এক আদিম উপজাতি চুকাহামাই-দের কিছু লোক এখনো রয়েছে, যারা
এই সেদিন পর্যন্ত ছিল প্রস্তরযুগের মানুষ। ব্রাসিলিয়া থেকেই আমাদের সঙ্গে
থাকবেন একজন বিশেষজ্ঞ, যাকে এখানকার ভাষায় বলা হয় সেরটানিস্টা।
কথাটার মানে হল অরণ্য-অভিজ্ঞ। সেরটানিস্টারা উপজাতিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব
স্থাপনে অগ্রণী; তাদের ভাষা থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই এরা খুব ভাল ভাবে
জানে।

পোরোরি ছেড়ে আরো খানিকটা পথ উত্তরে গিয়ে ভন মাটিয়ুস জলপ্রপাত দেখে আবার ব্রাসিলিয়া ফিরে এসে সেখান থেকে প্লেন ধরে যে যার দেশে ফিরব। দিন সাতকের মধ্যে পুরো সফর হয়ে যাওয়া উচিত, তবে ব্রেজিল সরকার বলেছেন প্রয়োজনে আতিথেয়তার মেয়াদ তিনদিন পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন তাঁরা।

সাড়ে এগারোটা বাজে, তাই ক্রোল ও সন্দার্শ উঠে পড়ল। ক্রোল যে আয়াদের দু'জনের সঙ্গে একমত নয়, সেটা সে যাবার আগে জানিয়ে দিয়ে গেল দুরজার মখ্টাতে দাঁড়িয়ে।

“আমার অবাক লাগছে, শঙ্খ, যে তুমি তোমার এত কাছের লোককে চিনতে পারছ না। তোমার এই সেক্রেটারিটির চোখের দৃষ্টিই আলাদা। হোটেলের লবিতে বসে যখন সে এল ডোরাডোর বর্ণনা দিচ্ছিল, তখন আমি ওর চোখ থেকে চোখ ফেরাতে পারচিলাম না।”

সন্দর্ভ কথাটা শুনে আমার দিকে চেয়ে ঢোক টিপে হাতে গেলাস ধরার মুদ্রা
করে বুঝিয়ে দিল যে, ক্রোল আজ পাঁচটি শ্যাম্পেনটা একটু বেশি খেয়েছে।

ବାରୋଟା ବେଜେ ଗେଛେ । ଶହର ନିଷ୍ଠକ । ଶୁଯେ ପଡ଼ି ।

১৩ই অক্টোবর, হোটেল ক্যাপিটল, ব্রাসিলিয়া, দপ্তর আডাইটা

ଆମରା ଘଟାଖାନେକ ହଳ ଏଥାନେ ପୋଛେଛି । ଆମରା ମାନେ ଆମରା ତିନ ବନ୍ଧୁ ଓ ମିଃ ଲୋବୋ । ଲୋବୋ ପୁରୋ ସଫରଟୀଇ ଆମାଦେର ସଙ୍ଗେ ଥାକରେନ । ଆମି ଅନ୍ତରେ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଜନ୍ୟ ଓ ସୌଜନ୍ୟର କୋନୋ ଅଭାବ ଲକ୍ଷ କରିନି ଭଦ୍ରଲୋକେର ବାବହାରେ ।

এখানে নকুড়বাবুর কথাটা স্বভাবতই এসে পড়ে. যদিও কোনো প্রসঙ্গের

দরকার ছিল না। সোজা বাংলায় বলতে গেলে ভদ্রলোক আমাকে লেন্দ্রি
মেরেছেন, এবং সেটা যে টাকার লোভে সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

আজ সাও পাউলোতে আমার রুম বয় সকালের কফির সঙ্গে একটা চিঠি এনে
দিল। বাংলা চিঠি, আর হস্তাঙ্ক আমার চেনা। আগেরটাই তুলনায় বলতেই হয়।
এটার ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই হল চিঠি—
প্রিয় তিলুবাৰু,

ଅଧିମେର ଅପରାଧ ଲାଇବେନ ନା । ନଗଦ ପାଁଚ ହାଜାର ଡଲାରେର ଲୋଭ ସଂବରଣ କରା
ସମ୍ଭବପର ହିଲ ନା । ଆମାର ପିତାମହୀ ଆଜ ଚାରି ବଂସର ଯାବ୍ ଏକ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ
ବ୍ୟାଧିତେ ଶ୍ୟାମାୟୀ । ଆମି ସାଡେ ଆଟ ବଂସର ବସ୍ୟମେ ଆମାର ମାତ୍ରଦେବୀକେ ହାରାଇ ।
ତଥନ ହିତେ ଆମି ଆମାର ପିତାମହୀର ଦ୍ୱାରାଇ ଲାଲିତ । ଶୁନିଯାଛି ଏ-ଦେଶେ ଏଇ
ରୋଗେର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୃତନ ଔଷଧ ବାହିର ହଇଯାଛେ । ଔଷଧେର ମୂଲ୍ୟ ଅନେକ ।
ବୁଝଗାଟେନ ସାହେବେର ବଦାନ୍ୟତାଯ ଏଇ ମହାର୍ଥ ଔଷଧ କିନିଯା ଦେଶେ ଫିରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ
ହିଁସେ ଆମାର ।

আজ সকালেই আমরা ব্লুমগাটেন মহাশয়ের ব্যক্তিগত হেলিকপ্টার বিমানে
রওনা হইতেছি। আমাদের লক্ষ্য সাও পাউলোর সাড়ে তিন শো মাইল
উত্তর-পশ্চিমে একটি অরণ্য অঞ্চল। এই অরণ্যের মধ্যেই এল ডোরাডো
অবস্থিত। আমার সাহায্য ব্যতীত ব্লুমগাটেন মহোদয় কোনোক্রমেই এল ডোরাডো
পুরুষের পারিবেন না। তাঁহার প্রতি অনুকম্পাবশত আমি নির্দেশ দিতে সম্মত
হইয়াছি। আমার কার্য সমাধা হইলেই আমি আপনাদের সহিত মিলিত হইব।
আপনাদের যাত্রাপথ আমার জানা আছে।

ঈশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল করুন। আমি যদি ঈশ্বরের কৃপায় আপনার
ক্রান্তের সাহায্য করিতে পারি, তবে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। ইতি

দাসানুদাস সেবক
শ্রীনকড়চন্দ্ৰ বিশ্বাস

হোটেলের রিসেপশনে খৌঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, নকুড়বাবু সত্তিই বেরিয়ে
গেছেন ভোর ছাঁটায়। জনেক বিশালবপু ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে ছিলেন
কি?—আজ্ঞে হ্যাঁ, ছিলেন।

আমার চেয়েও বেশি বিরক্ত হয়েছে সন্ডাৰ্স, এবং সেটা শুধু নকুড়বাবুর উপর নয় ; আমার উপরেও । বলল, “তোমার-আমার মতো লোকের এই ভৌতিক অলৌকিক প্রেতলৌকিক ব্যাপারগুলো থেকে যতদূর দূরে থাকা যায় ততই ভাল ।”

କ୍ରେତ୍ର କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପାରଟା ଶୁଣେ ବେଶ ମୁସଡ୍ଦେ ପଡ଼େଛେ ; ଏବଂ ସେଟା ଅନ୍ୟ କାରଣେ ।

সে বলল, “তোমার লোক যখন বলছে আমাদের আবার মীট করবে, তখন বোৱাই যাচ্ছে যে, এল ডোরাডো আমাদের গন্তব্যস্থল থেকে খুব বেশি দূর নয়। সেখনে আমরাও যে কেন সেখানে যেতে পারিনা সেটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।”

আমি আর সন্দৰ্ভ ক্রোলের এই অভিযোগ কিছু কানে তুললাম না।

ব্রাসিলিয়া ব্রেজিলের রাজধানী হলেও সাও পাউলোর সঙ্গে কোনো তুলনা চলে না। আমরা হোটেলে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের দলে যে সেরটানিস্টা বা অরণ্য-অভিজ্ঞ ভদ্রলোকটি যাবেন—নাম হাইটর—তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। বয়স বেশি না হলেও, চেহারায় একটা অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে। তার উপরে ঠাণ্ডা মেজাজ ও মিঞ্চ ব্যবহার দেখে মনে হয় উপজাতিদের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য ইনিই আদর্শ ব্যক্তি। তাঁকে আজ ক্রোল জিগ্যেস করেছিল এল ডোরাডোর সম্পর্কে তাঁর কী ধারণা। প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে বললেন, “আজকের দিনে আবার এল ডোরাডোর প্রশ্ন তুলছেন কেন? সে তো কোনকালে মিথ্যে বলে প্রমাণ হয়ে গেছে। এল ডোরাডো তো শহরই নয়; আসলে ওটা একজন ব্যক্তি। ডোরাডো কথাটা সোনার শহর বা সোনার মানুষ দুইই বোঝায় পর্তুগীজ ভাষায়। সুর্যের প্রতীক হিসেবে কোনো এক বিশেষ ব্যক্তিকে পুরাকালে এখনকার অধিবাসীরা পুজো করত, আর তাকেই বলত এল ডোরাডো।”

চোখের পলকে একজন মানুষকে কখনো এমন হতাশ হতে দেখিনি, যেমন দেখলাম ক্রোলকে।

কাল সকালে আমাদের আবার যাত্রা শুরু। নকুড়বাবু অন্যায় কাজ করেছেন সেটা ঠিকই, কিন্তু তার জন্য আমিই যে বেশ খানিকটা দায়ী সেটা ও ভুলতে পারছি না। আমিই তো প্রথম তাঁকে আমার সঙ্গে নিয়ে আসার প্রস্তাবটা করি।

১৬ই অক্টোবর, বিকাল সাড়ে চারটা

বাহারের নকশা করা ক্যানু নোকাতে জিঞ্জু নদী ধরে আমরা চলে এসেছি প্রায় তেত্রিশ মাইল। আমরা পাঁচজন—অর্থাৎ আমি, ক্রোল, সন্দৰ্ভ, লোবো আর হাইটর—ছাড়া রয়েছে দু'জন নোকাবাহী দক্ষিণ আমেরিকান ইন্ডিয়ান। আরো দু'জন নোকাবাহী সহ আরেকটি ক্যানুতে চলেছে আমাদের মালপত্র রসদ ইত্যাদি। এখন আমরা নদীর ধারে একটা অপেক্ষাকৃত পরিকার জায়গা বেছে সেখানে তাঁবু ফেলেছি। তাঁবুর কাছেই তিনটি গাছে দুটি হ্যামক বাঁধা রয়েছে; সন্দৰ্ভ ও ক্রোল তার এক-একটি দখল করে তাতে শুয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছে ব্রেজিলের বিখ্যাত অ্যানাকোভা সাপ নিয়ে। এই অ্যানাকোভা যে সময়-সময়

নকুড়বাবু ও এল ডোরাডো

বিশাল আকার ধারণ করে, সেটা অনেক পর্যটকের বিবরণ থেকেই জানা যায়। ক্রোলের মতে ত্রিশ হাত পর্যন্ত লম্বা হওয়া কিছুই আশ্চর্য না। সন্দৰ্ভ সেটা বিশ্বাস করতে রাজি নয়। এখানে বলে রাখি যে, আমাদের তিনজনের কেউই চিড়িয়াখানার বাইরে অ্যানাকোভা দেখিনি। এ-যাত্রায় আমাদের ভাগ্যে অ্যানাকোভার সাক্ষাৎ পাওয়া আছে কিনা জানি না। না থাকলেও, আমার অন্তত তাতে আপসোস নেই। লতাগুল্ম-ফলমূল-কীটপতঙ্গ-পশুপাখিতে ভরা ব্রেজিলের জঙ্গলের যে রূপ আমরা এখন পর্যন্ত দেখেছি, তার কোনো তুলনা নেই। বন গভীর ও অন্ধকার হলেও তাতে রঙের অভাব নেই। প্রায়ই চোখে পড়ে লান্টানা ফুলের বোপ, হরেক রঙের প্রজাপতি আর চোখ-ঘলসানো সব কাকাতুয়া শ্রেণীর পাখি। নোকা চলার সময় জলে হাত দেওয়া বারণ, কারণ নদীতে রাঙ্কুসে পিরানহা মাছের ছড়াচাড়ি। কালই নদীর ধারে একটা কেইম্যান কুমিরের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলাম; তার মাথার দিকের খানিকটা অংশে ছাড়া আর কোথাও মাংস নেই, শুধু হাড়। মাংস গেছে পিরানহার পেটে।

ব্রেজিলের অনেক অংশেই বহুদিন পর্যন্ত বাইরের মানুষের পা পড়েনি। গত বছর-দশকের মধ্যে বেশ কিছু জঙ্গল কেটে চাবের জমি বাড়ানো হয়েছে। সেই সঙ্গে ব্রেজিল সরকারের হাইওয়ে বানানোর কাজও চলেছে জঙ্গল কেটে, আর ডিনামাইটের সাহায্যে পাহাড় উড়িয়ে। আমরা আসার পথেও বেশ কয়েকবার ডিনামাইট বিফোরণ বা ব্লাস্টিং-এর শব্দ পেয়েছি। কাল মাঝরাত্রে একটা গুরুগন্তির বিফোরণের শব্দে আমাদের ক্যাম্পের সকলেরই ঘূম ভেঙে যায়। শব্দতরঙ্গের চাপ এত প্রবল ছিল যে, ক্রোলের বিয়ার-প্লাস্টা তার ফলে ফেটে চোঁচির হয়ে গেল। আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল, তাই আজ সকালে হাইটরকে জিগ্যেস করলাম কাছাকাছি কোনো আগ্রহের আছে কিনা। হাইটর মুখে কিছু না বলে কেবল গন্তীরমুখে মাথা নাড়ল।

১৭ই অক্টোবর, ভোর ছটা

কাল রাত্রে এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

রাত্রে মশা, আর দিনে জ্বালাতুনে ব্যারাকুদা মাছির উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমি গিরিডি থেকেই একরকম মলম তৈরি করে এনেছিলাম। তিন বন্ধুতে সেই মলম মেখে সাড়ে নটার মধ্যেই যে-যার ক্যাম্পে শুয়ে পড়েছিলাম। যদিও এখানে রাত্রেও নিষ্কৃতা বলে কিছু নেই, যিকি থেকে শুরু করে জাগুয়ার পর্যন্ত সব কিছুরই ডাক শোনা যায়, তবু দিনের ক্লাস্টির জন্য ঘূমটা এসে যায় বেশ তাড়াতাড়ি। সেই ঘূম হঠাৎ ভেঙে গেল এক বিকট চিৎকারে।

আমি ও সন্দৰ্ভ হস্তদণ্ড আমাদের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে দেখি ক্রোলও তার



তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছে, এবং তৃতীয় তাঁবু থেকে হাইটের।

কিন্তু মিঃ লোবো কোথায়?

ক্রোল টর্চ্চা জ্বালিয়ে এদিক-ওদিক ফেলতেই দেখা গেল ভদ্রলোককে। মুখ বিকৃত করে বিশ হাত দূরে একটা ঘোপের পাশ থেকে খৌড়াতে-খৌড়াতে এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। আর সেই সঙ্গে পর্তুগীজ ভাষায় পরিত্রাহি ডেকে চলেছেন ভগবান যীশুকে।

“আমার পায়ে দিয়েছে কামড়, আমি আর নেই”—সভার্সের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন মিঃ লোবো।

কামড়টা মাকড়সার, এবং সেটা ডান পায়ের পাতার ঠিক উপরে। লোবো গিয়েছিলেন একটি ঘোপের ধারে ছোট কাজ সাবতে। হাতের সোনার ঘড়ির ব্যাস্তা নাকি এমনিতেই একটু আলগা ছিল; সেটা খুলে পড়ে যায় মাটিতে। টর্চ জ্বালিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজতে গিয়ে মাকড়সার গর্তে পা পড়ে। কামড়ে বিষ আছে ঠিকই, তবে মারাত্মক নয়। কিন্তু লোবোর ভাব দেখে সেটা বোঝে কার সাধ্য।

ওষুধ ছিল আমার সঙ্গে; সেটা সভার্সের টর্চের আলোতে লাগিয়ে দিচ্ছি ক্ষতের জায়গায়, এমন সময় লোবোর মুখের দিকে চোখ পড়তে একটা অন্দুত ভাব লক্ষ করলাম। তাতে আতঙ্ক ও অনুশোচনার এক বিচ্চির সংমিশ্রণ। তাঁর দৃষ্টি আমারই দিকে।

“কী হয়েছে তোমার?” আমি জিগ্যেস করলাম।

“আমি পাপ করেছি, আমায় ক্ষমা করো।” কাতর কঢ়ে প্রায় কানার সুরে বলে উঠলেন মিঃ লোবো।

“কী পাপের কথা বলছ তুমি?”

মিঃ লোবো দু'হাত দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর ঠোঁট কাঁপছে, চোখে জল। সভার্স ও ক্রোল বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে তাঁর দিকে।

“সেদিন রাত্রে,” বললেন মিঃ লোবো, “সেদিন রাত্রে প্রহরীকে ঘুষ দিয়ে প্রদর্শনীতে চুকে আমি তোমার গবেষণার নেটসের খাতা বার করে নিয়েছিলাম। তারপর...”

রীতিমত কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে, কিন্তু তাও বলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে লোকটা।

“তারপর... সেগুলোকে জীরক্ক করে আবার যথাস্থানে রেখে দিই।”

এবার আমি প্রশ্ন করলাম। “তারপর?”

“তারপর—কপিগুলো—দিয়ে দিই মিঃ ব্রুমগার্টেনকে। তিনি আমায়... টাকা... অনেক টাকা...”

“ঠিক আছে। আর বলতে হবে না।”

মিঃ লোবো একটা দীর্ঘশাস ত্যাগ করলেন। “কথাটা বলে...হালকা লাগছে... অনেকটা—এবার নিশ্চিন্তে মরতে পারব।”

“আপনি মরবেন না, মিঃ লোবো,” শুকনো গলায় বলল সন্দার্শ। “এ মাকড়সার কামড়ে ঘা হয়, মৃত্যু হয় না।”

মিঃ লোবোর ঘা আমার ওষুধে শুকোবে ঠিকই, কিন্তু তিনি আমার যে ক্ষতিটা করলেন সেটা অপূরণীয়।

শ্রীমান নকুড়চন্দ্র এক বর্ণও ভুল বলেননি।

তার মানে কি এল ডোরাডো সত্যিই আছে?

১৮ই অক্টোবর, রাত দশটা, হোটেল ক্যাপিটল, ব্রাসিলিয়া

আমাদের ব্রেজিল সফরের অপ্রত্যাখ্যিত, অবিশ্বরণীয় পরিসমাপ্তির কথাটা এই বেলা লিখে ফেলি, কারণ কাল সকালেই আমরা যে যার দেশে ফিরছি। এটুকু বলতে পারি যে, সন্দার্শের যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনের ভিত এই প্রথম দেখলাম একটা বড় রকম ধাক্কা খেল। সে মানতে বাধ্য হয়েছে যে, সব ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস, আখেরে এর ফল ভালই হবে।

এইবার ঘটনায় আসি।

গতকাল সকালে ব্যাঙ্গেজবন্ড লোবোকে সঙ্গে নিয়ে আমরা ক্যানু করে বেরিয়ে পড়লাম চুকাহামাই উপজাতিদের বাসস্থান পোরোরির উদ্দেশে। আমাদের যেতে হবে আরো প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার। যত এগোচ্ছি ততই যেন গাছপালা ফুলফল পাখি প্রজাপতির সম্ভাব বেড়ে চলেছে। এই স্বপ্নবাজের মনোমুক্তকারিতার মধ্যে আতঙ্কের খাদ মিশে আছে বলে এটা যেন আমার কাছে আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আমি জানি, এ-ব্যাপারে সন্দার্শ ও ক্রোল আমার সঙ্গে একমত। তারা যে খরশ্বেতা নদীর উপকূলের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে, তার একটা কারণ বোধহয় আনাকোভা দর্শনের প্রত্যাশা। এখনো পর্যন্ত সে-আশা পূরণ হবার কোনো লক্ষণ দেখছি না। মাইলখানেক যাবার পর আমাদের নেোকা থামাতে হল।

নদীর ধারে তিনজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে; তারা হাইটের দিকে হাত তুলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে অচেনা ভাষায় কী যেন বলছে। আমি জানি এখনকার উপজাতিদের মধ্যে ‘গে’ নামে একটা ভাষা প্রচলিত আছে, যেটা হাইট খুব ভালভাবেই জানে।

হাইট লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলে আমাদের তিনজনকে উদ্দেশ করে বলল, “এরা স্থানীয় ইন্ডিয়ান। এরা আমাদের পোরোরি যেতে বারণ করছে।”

“কেন?”—আমরা তিনজনেই প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করলাম।

নকুড়বাবু ও এল ডোরাডো

“এরা বলছে চুকাহামাইরা কী কারণে নাকি ভয়ানক উদ্বেজিত হয়ে রয়েছে। কালই নাকি একটা জাপানী দল পোরোরি গিয়েছিল; তাদের দু'জনকে এরা বিষাক্ত তীর দিয়ে মেরে ফেলেছে।”

আমি জানি কুরারি নামে এক সাঞ্চাতিক বিষ ব্রেজিলের আদিম জাতিরা তাদের তীরের ফলায় মাখিয়ে শিকার করে।

“তাহলে এখন কী করা যায়?” আমি প্রশ্ন করলাম।

হাইট বলল, “আপাতত এখনেই ক্যাম্প ফেলা যাক। আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি বরং একটা ক্যানু নিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা আঁচ করে আসি।”

“কিন্তু এই হঠাৎ-উদ্বেজনার কারণটা কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?” সন্দার্শ প্রশ্ন করল।

হাইট বলল, “আমার একটা ধারণা হচ্ছে পরশু রাত্রের বিস্ফোরণের সঙ্গে এটা যুক্ত। বড় রকম একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে এরা এখনো সেটাকে দেবতার অভিশাপ মনে করে বিচলিত হয়ে পড়ে।”

অগত্যা নামলাম আমরা ক্যানু থেকে।

জায়গাটা যে ক্যাম্প ফেলার পক্ষে আদর্শ নয় সেটা বেশ বুবতে পেরেছি। এখনে সাধারণত নদীর পাশে খনিকটা দূর অবধি জঙ্গল গভীর থাকে। ভিতরে কিছুটা অগ্সর হলে দেখা যায় বন পাতলা হয়ে এসেছে। এই জায়গাটায় কিন্তু যতদূর অবধি দৃষ্টি যায়, তাতে অরণ্যের ঘনত্ব হ্রাস পাবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না।

নদীর দশ-পনেরো গজের মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গাপেয়ে আমরা সেখানেই বিশ্রামের আয়োজন করলাম। কতক্ষণের অপেক্ষা জানা নেই, তাই তাঁবুও খাটিয়ে ফেলা হল—বিশেষ করে লোবোর জন্য। সে ভালুর দিকে যাচ্ছে জেনেও মিনিটে-মিনিটে যীশু ও মেরি মাতাকে শ্মরণ করছে। হয়তো সেটা এই কারণেই যে, সে অনুমান করছে আমরা শহরে ফিরে গিয়েই তার বিরক্তে অভিযোগ পেশ করব। এ আশঙ্কা যদি সে সত্যিই করে থাকে, তবে সেটা ভুল নয়, কারণ আমি তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত থাকলেও, ক্রোল ও সন্দার্শ দু'জনেই লোবোর গদান নিতে বন্ধপরিকর। আর ব্রুমগাটেনকে পেলে তারা নাকি তার মাংস সিদ্ধ করে ব্রেজিলের নরমাসভুক উপজাতির সন্ধান করে তাদের নেমস্তন্ম করে খাওয়াবে। তাদের বিশ্বাস ব্রুমগাটেনের মাংসে অন্তত বারো জনের ভূরিভোজ হবে।

আমরা তিনজনেই বেশ ক্লান্ত। পর পর চারটি বড় গাছের গুড়িতে তিনটি হ্যামক টাঙ্গিয়ে তিনজনে শুয়ে মৃদু দোল খাচ্ছি, কাছেই বনের ভিতর থেকে

মাবে-মাবে শুনতে পাচ্ছি চুরিয়াঙ্গি পাখিৰ কৰ্কশ ডাক, এমন সময় সন্দৰ্ভ হঠাৎ
একটা গোঙানিৰ মতো শব্দ কৰে উঠল। আৱ সেই সঙ্গে আমাদেৱ নৌকাৰ দু'জন
মাঝি একসঙ্গে তাৰুষৰে চিৎকাৰ কৰে উঠল।

এই গোঙানি ও চিৎকাৰেৱ কাৰণ যে একই, সেটা বুবাতে আমাৰ ও ক্ৰোলেৱ
তিনি সেকেড়েৱ বেশি সময় লাগেনি।

আমাদেৱ থেকে দশ-বাৱো গজ দূৰে একটা দীৰ্ঘকাৰ গাছেৱ উপৰ দিকেৱ
একটা ডাল বেয়ে যেন আমাদেৱই লক্ষ কৰে নেমে আসছে একটা সাপ, যেমন
সাপেৱ বৰ্ণনা পুৱাণ বা কল্পকথাৰ বাইৱে কোথাৰ পড়েছি বলে মনে পড়ে না।

এ সাপেৱ নাম জানি, হয়ত স্বাভাৱিক অবস্থায় থাকলে বিশ্বয়েৱ তাড়নায়
নামটা আপনা থেকেই মুখ থেকে বেৱিয়ে আসত, কিন্তু এখন দেখলাম গলা দিয়ে
আওয়াজ বেৱোনোৰ কোনো প্ৰশংসন ওঠে না। আতকেৱ সঙ্গে একটা বিম-ধৰা
ভাৱ, যেটা পৱে ক্ৰোল ও সন্দৰ্ভকে জিগ্যেস কৰে জেনেছিলাম তাৰেৱও
হয়েছিল।

ব্ৰেজিলেৱ এই অতিকায় ময়াল মাটি থেকে প্ৰায় বিশ হাত উঁচু ডাল থেকে
যখন মাটি-হুই-হুই অবস্থাতে পৌঁছেছে, তখনও তাৱ আৱো অৰ্বেক নামতে বাকি।
তাৱ মানে এৱ দৈৰ্ঘ্য ঘাট ফুটেৱ কম নয়, আৱ প্ৰশংসন এমনই যে, মানুষ দু'হাতে বেড়
পাৰে না।

আমি এই অবস্থাতেও বুবাতে চেষ্টা কৰছি আমাৰ মনেৱ ভাৱেৱ মধ্যে কতটা
বিশ্বয় আৱ কতটা আতঙ্ক, এমন সময় পিছন দিক থেকে একটা পৱিচিত কঠিন
পাৰাব সঙ্গে-সঙ্গে আমাদেৱ তিনজনকে বেকুব বানিয়ে দিয়ে ঢোকেৱ সামনে থেকে
অ্যানাকোন্ডাপৰ বেমালুম উধাও।

“আপনাদেৱ আশ মিটেছে তো ?”

আমাদেৱ পিছনে কখন যে একটি ক্যানু এসে দাঁড়িয়েছে এবং কখন যে তাৱ
থেকে শ্ৰীমান নকুড়চন্দ্ৰ অবৰ্তীৰ্ণ হয়েছেন, তা জানি না।

“আপনার সঙ্গে পৱিচয় কৰিয়ে দিই,” এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়ানো একটি
সাহেবেৱ দিকে নিৰ্দেশ কৰে বললেন নকুড়বাবু,—“ইনি হলেন ব্ৰুমগাটেন
সাহেবেৱ বিমানচালক মিস্টাৱ জো হপগুড। ইনিই সাহেবেৱ হেলিকপ্টাৱেৱ কৰে
আমাকে নিয়ে এলেন। শুধু শেষেৱ দেড় মাইল পথ আমাদেৱ ডিঙিতে আসতে
হয়েছে।”

ক্ৰোল আৱ থাকতে না-পৱে বলে উঠল—“হি মেড আস সী দ্যাট মেক !”

আমি বললাম, “তোমাকে তো বলেইছিলাম ওনাৰ মধ্যে এই ক্ষমতাৱও একটা
আভাস পেয়েছিলাম দেশে থাকতেই।”

“ঘাট দিস ইজ ইনক্ৰেডিবল !”

নকুড়বাবু ও এল ডোৱাড়ো

নকুড়বাবু লজজায় লাল। বললেন, “তিলুবাবু, আপনি দয়া কৰে এঁদেৱ বৃথায়ে
দিন যে, এতে আমাৰ নিজেৱ কৃতিত্ব কিছুই নেই। এসবই হল যিনি আমায়
চালাচ্ছেন, তাৰই খেলা।”

“কিন্তু এল ডোৱাড়ো ?”

“সে তো দেখিয়ে দিয়েছি সাহেবকে হেলিকপ্টাৱ থেকেই। যেমন সাপ
দেখালুম, সেইভাবেই দেখিয়েছি। বৱদা বাঁড়ুজোৱ বইয়েতে কিছু ছবি ছিল, মদন
পালেৱ আঁকা। সাপেৱ ছবি, এল ডোৱাড়োৱ ছবি, সবই ছিল। বাজে ছবি মশাই।
সোনাৰ শহৱেৱ বাড়িগুলো দেখতে কৱেছে টোল-খাওয়া টোপৱেৱ মতো—তাৰ
সিধে নয়, ট্যারচা। সাহেবও সেই ছবিৰ মতো শহৱই দেখলে, আৱ দেখে বললেন,
“এল ডোৱাড়ো ইজ ব্ৰেথ-টেকিং।”

“তাৰপৰ ?”

আমাৰ মন্ত্ৰমুক্তিৰ মতো শুনছি নকুড়বাবুৰ কথা।

“তাৰপৰ আৱ কী ?—জঙ্গলেৱ মধ্যে শহৱ। সেখানে হেলিকপ্টাৱ নামবে কী
কৰে ? নামলুম জঙ্গলেৱ এদিকটায়। সাহেব দুই বন্দুকধাৰীকে নিয়ে তুকে
পড়লেন, আৱ আমি চলে এলুম আমাৰ কথামতো আপনাদেৱ মীট কৰিব বলে।
আমি জানি আপনারা কী ভাবছেন—হপগুড সাহেব আমাকে আনতে রাজি হলেন
কেন। এই তো ? ব্ৰুমগাটেন সাহেবেৱ সঙ্গে চুক্তি ছিল উনি এল ডোৱাড়ো চাক্ষুয়
দেখলেই আমাৰ হাতে তুলে দেবেন নগদ পাঁচ হাজাৰ ডলাৱ। হপগুডকে বলে
ৱেখেছিলুম, আড়াই দেব ওকে যদি ও আমাকে পৌঁছে দেয় আপনাদেৱ কাছে।
দেখন কীৱকম কথা ৱেখেছেন সাহেব—মনটা কীৱকম দৰাজ ভেবে দেখন !
আৱ, ও হাঁ—এল ডোৱাড়ো দেখা গেলে ব্ৰুমগাটেন সাহেব এটাও কথা
দিয়েছিলেন যে, তিনি আপনার গবেষণাৰ কাগজপত্ৰেৱ কপি ফেৱত দেবেন।
এই নিন সেই কাগজ।”

নকুড়বাবু তাৰ কোটেৱ পকেট থেকে রাবাৱ-ব্যাণ্ডে বাঁধা এক তাড়া কাগজ বাৱ
কৰে আমাৰ হাতে তুলে দিলেন। আমি এত মুহামান যে মুখ দিয়ে কোনো কথাই
বেৱোল না। এৱ পৱেৱ প্ৰশ্নটা ক্ৰোলই কৰল।

“কিন্তু ব্ৰুমগাটেন যখন দেখবে এল ডোৱাড়ো নেই, তখন কী হবে ?”

প্ৰশ্নটা শুনে নকুড়বাবুৰ অটুহাসিতে আশেপাশেৱ গাছ থেকে খান তিনেক
ম্যাকাও উড়ে পালিয়ে গেল।

“ব্ৰুমগাটেন কোথায় ?” কোনোমতে হাসি থামিয়ে বললেন নকুড়
বিশ্বাস।—“তিনি কি আৱ ইহজগতে আছেন ? তিনি জঙ্গলে ঢোকেন বিকেল
সাড়ে পাঁচটাৱ্যাই। তাৱ ছ’ ঘণ্টা পৱে, রাত এগাৱোটা তেক্ৰিশ মিনিটে, এল
ডোৱাড়োয় উল্কাপাতেৱ ফলে সাড়ে তিনি মাইল জুড়ে একটি গোটা জঙ্গল

একেবাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ-ষট্টনাও যে আপনাদের আশীর্বাদে আগে
থেকেই জানা ছিল, তিলুবাবু ! আপনার মতো এমন একজন লোক, যাঁর সঙ্গ
পেয়ে আজ আমি তিন শো টাকা দামের একটি বিলিতি ওষুধ কিনে নিয়ে যেতে
পারছি আমার ঠাকুমার জন্য, তাঁর শত্রুর কি আর শেষ রাখতে পারি আমি ?”

ব্রাসিলিয়ায় এসেই দেখেছি খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার অর্ধেকটা জুড়ে
রয়েছে কুইয়াবা—সাস্ত্রোম হাইওয়ের ত্রিশ কিলোমিটার পশ্চিমে একটি গভীর
অরণ্যে আনুমানিক কুড়ি লক্ষ টন ওজনের একটি উচ্চাপাতের খবর।
সৌভাগ্যক্রমে এই অঞ্চলে কোনো মানুষের বাস ছিল না। জীবজন্তু গাছপালা
ইত্যাদি যা ছিল তা সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

মরণহস্য

৫

১০ই জানুয়ারি

তুন বছরের প্রথম মাসেই একটা দুঃসংবাদ। ডিমেট্রিয়াস উধাও ! প্রোফেসর
নেস্টের ডিমেট্রিয়াস, বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ। ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপের
রাজধানী ইরাক্লিয়ন শহরের অধিবাসী ছিলেন ডিমেট্রিয়াস। আমার সঙ্গে চাকুষ
পরিচয় ছিল না, তবে পত্রালাপ হয়েছে বছর তিনেক আগে। ভদ্রলোক প্রাচীন
চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করছেন জানতে পেরে আমি আমাদের আয়ুর্বেদ
শাস্ত্রের কিছু খবর দিয়ে তাঁকে চিঠি লিখি। তিনি পাওয়ামাত্র ধন্যবাদ জানিয়ে
উত্তর দেন। মুক্তের মতো ইংরিজ হাতের লেখা, ভাষার উপরেও আশ্চর্য দখল।
পরে আমার বক্তু প্রোফেসর সামারভিলের কাছে জানতে পারি ডিমেট্রিয়াস নাকি
কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কাল সামারভিলের চিঠিতেই ভদ্রলোকের
নিরুদ্দেশের খবরটা পাই। চিঠি থেকে যা জানা গেল তা মোটামুটি এই—

গত ৪ঠা জানুয়ারি সকাল আটটার সময় প্রোফেসর ডিমেট্রিয়াস একটা
সুটকেস হাতে নিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যান। তাঁর চাকর তাঁকে
বেরোতে দেখেছিল, কিন্তু মনিব কোথায় যাচ্ছেন সে খবর তার জানা ছিল না।
সন্ধ্যা পর্যন্ত ভদ্রলোক বাড়ি না ফেরায় চাকর পুলিশে খবর দেয়। তদন্তে জানা
যায় প্রোঃ ডিমেট্রিয়াস নাকি একটা ট্যাক্সি করে ইরাক্লিয়ন বিমান বন্দরে যান।
সেখান থেকে সকাল সাড়ে দশটার সময় তিনি একটা প্লেন ধরেন। সে প্লেন যায়
কায়রোতে। কায়রোতে খবর করে জানা যায় তিনি নাকি আলহাম্ব্ৰা হোটেলে
উঠেছিলেন, এবং মাত্র একৰাত সেখানে থাকেন। তারপর থেকে তাঁর আর
কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

চিঠিটা সামারভিল লিখেছে ইরাক্লিয়ন থেকে। ডিমেট্রিয়াসের বক্তু ছিল
সামারভিল। এথেন্সে একটা বক্তৃতা দিতে এসেছিল। এমনিতেই মতলব ছিল

বক্তৃতার পর একবার ক্রীটে ঘুৰে যাবে। এথেন্সে থাকতে থাকতেই সংবাদপত্রে ডিমেত্রিয়াসের অন্তর্ধানের খবর পেয়ে অন্য কাজ ফেলে সোজা ইরাক্লিয়নে চলে যায়। এখন ও নিজেই তদন্ত চালাবে বলে স্থির করেছে। ওকে সাহায্য করবার জন্য আমায় ডাকছে। গীসে গেছি এর আগে দুবার, কিন্তু ক্রীটটা যাওয়া হয়নি। মন্টা উড় উড় করছে, হাতে বিশেষ কাজও নেই, তাই ভাবছি ঘুৰে আসি।

১৪ই জানুয়ারি

আজ সকালে ইরাক্লিয়ন এসে পৌঁছেছি। শহর থেকে তিনি মাইল দূরে সাইলোরিটি পাহাড়ের ঠিক পায়ের কাছে ডিমেত্রিয়াসের বাড়ি। চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য; কিন্তু সেটা উপভোগ করার সময় এটা নয়। সামারভিল বেশ চিত্তিত, এবং তার চিন্তার কারণও আছে যথেষ্ট। প্রথমত, কায়রোতে অনুসন্ধান করেও আর কোনো খবর আসেনি। দ্বিতীয়ত, ডিমেত্রিয়াসের এভাবে না বলে ক'য়ে চলে যাবার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর ল্যাবরেটরিতে জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেও ইদনীং তিনি কী বিষয়ে গবেষণা করছিলেন তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। তাঁর একটা সবুজ রঙের খাতা পাওয়া গেছে যেটা মনে হয় তিনি সম্প্রতি ব্যবহার করেছিলেন। তাতে লেখা আছে বিস্তর, কিন্তু সে মনে হয় তিনি সম্প্রতি ব্যবহার করেছিলেন। কায়রোতে আছে বিস্তর, কিন্তু সে লেখার জন্য এমন এক উন্নত ভাষা ও উন্নত অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে, যার কুলকিনারা করা সম্ভব হয়নি। আমি নিজেও সে খাতাটা দেখেছি এবং তার লেখা পড়ার চেষ্টা করেছি। একেকটা অক্ষর হঠাৎ দেখে ইঁরিজি বলে মনে হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি। ভাষাটা সাংঘাতিক হতে পারে কিনা জিগ্যেস করাতে সামারভিল বলল, ‘কিছুই আশ্চর্য নয়। ওর ভাষা সম্পর্কে একটা বিশেষ কোতৃহল ছিল। “লিনিয়ার-এ”-র ব্যাপারটা তুমি জান কি?’

আমি জানতাম খ্রিস্টপূর্ব দু'হাজার শতাব্দীতে ক্রীট দেশে যে ভাষা পাথরে খোদাই করে লেখা হত, তার নাম আজকের প্রত্নতাত্ত্বিকরা দিয়েছেন লিনিয়ার-এ। সামারভিল বলল এই ভাষা নিয়ে ডিমেত্রিয়াস নাকি বেশ কিছুদিন থেকে চৰ্চা করছেন। হয়ত এই খাতায় প্রাচীন শিলালিপি থেকে পাওয়া কোনো মূল্যবান তথ্যের বর্ণনা রয়েছে। ডিমেত্রিয়াসের চাকর মিথাইলি বলছিল যে তার মনিব নাকি সম্প্রতি প্রায়ই ইরাক্লিয়ন ছেড়ে ক্রীটের অন্যান্য প্রাচীন শহরে চলে যেতেন, এবং সেখানে পাঁচ সাতদিন করে থেকে পাথরের টুকরো ইত্যাদি সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরতেন। এইসব পাথরের টুকরো অনেকগুলিই অবশ্য বৈঠকখানায় ও ল্যাবরেটরিতে আমরা দেখেছি।

মিথাইলির আরেকটা কথিতেও সামারভিল বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। যেদিন ডিমেত্রিয়াস চলে যান, তার আগের দিনই নাকি সন্ধ্যাবেলো মিথাইলি একটা

বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পায়। সেটা আসে পিছনে পাহাড়ের দিক থেকে। ডিমেত্রিয়াস তখন বাড়ি ছিলেন না, কিন্তু ফিরে আসেন তার ঠিক দশ মিনিট পরেই। ডিমেত্রিয়াসের নিজের একটা বন্দুক ছিল, যদিও সেটা বহুকাল ব্যবহার হয়নি। সে বন্দুক নাকি এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না।

মিথাইলির একটা ছেলে আছে, বছর দশেক বয়স। ভারী চালাকচতুর। তার কথা বিশ্বাসযোগ্য কিনা জানি না, কিন্তু সে বলে যে যেদিন সন্ধ্যায় বন্দুকের আওয়াজ শোনা যায়, সেদিন নাকি সে দুপুর বেলা জঙ্গলের দিক থেকে বাধের গর্জন শুনেছিল। আমি জানি ক্রীট দ্বীপে কম্বিন কালেও বাঘ থাকা সম্ভব নয়, সুতরাং এ ছোক্রা গর্জন শুনে চিনল কী করে? জিগ্যেস করাতে ছেলেটি একগাল হেসে বলল যে ইরাক্লিয়নে সার্কাস এসেছিল, সেই সার্কাসে সে নাকি বাধের গর্জন শুনেছে। কথাটা মিথে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। মোটকথা সব মিলিয়ে বেশ গোলমেলে ব্যাপার।

আমরা ঠিক করেছি দুপুরের খাওয়া সেরে একবার পাহাড়ের দিকটা ঘুৰে আসব। ঘরের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি ওদিকটায় ঘন ঝাউবন। যদি কিছু ঘটে থাকে তো ওই বনের মধ্যেই ঘটেছে।

১৫ই জানুয়ারি

ইরাক্লিয়ন এয়ারপোর্টের রেস্টুরান্টে বসে ডায়ারি লিখছি। কায়রোর প্লেন ছাড়তে নাকি ঘণ্টাখানেক লেট হবে, তাই এই ফাঁকে কালকের অন্তু ঘটনাটা লিখে রাখি।

কাল লাঞ্চ সেরে প্রায় দুটো নাগাদ আমি আর সামারভিল পাহাড়ের গায়ে ঝাউবনের ভিতরটা একটু এক্সপ্লোর করতে বেরোলাম। বাড়ির পিছনে একটা পাতিলেবুর বাগান, সেটা পেরিয়েই পাহাড়ের চড়াই শুরু হয়।

ঝাউবনের ভিতর দিয়ে মিনিট দশেক হাঁটার পর, চোখে কিছু না দেখতে পেলেও, নাকে যেন একটা চেনা গন্ধ পাচ্ছি বলে মনে হল। সামারভিলের সার্দি হয়েছে, এতদূর থেকে সে গন্ধ পাবে না জানি, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম যে একশো গজের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা মরা জানোয়ার-টানোয়ার কিছু পড়ে আছে। আমি গন্ধের দিকে এগোতে লাগলাম, সামারভিল আমার পিছনে। ক্রমে সামারভিলের নাকেও গন্ধটা প্রবেশ করল। সে ফিস্স ফিস্স করে আমায় জিগ্যেস করল, ‘তুমি কি সশস্ত্র?’ আমি কোটের বুকপকেট থেকে আমার আ্যানাইহিলিন পিস্তলটা বার করে তাকে দেখিয়ে দিলাম। মৃত জানোয়ারের আশেপাশে কোনো জ্যান্ত জানোয়ার লুকিয়ে থাকতে পারে এটাই বোধহয় আশঙ্কা করছিল সামারভিল।

আমরা অতি সন্তুষ্ণে চারিদিকে চোখ রেখে এগোতে লাগলাম।
সামারভিলের দৃষ্টিই প্রথম গেলো শকুনিগুলোর দিকে। ঝাউবনের মাঝখানে
একটা অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় আট দশটা শকুনি মিলে একটা কালো মরা
জানোয়ারের মাংস থাচ্ছে। ব্যাপারটা ঘটছে অন্তত ত্রিশ হাত দূরে—কাজেই
জানোয়ারটা যে কী সেটা এখনো বুঝতে পারছি না। আরো কয়েক পা এগোতেই
আমার চোখ হঠাত চলে গেলো মাটির দিকে। আমাদের পায়ের ঠিক সামনে সাদা
বুনো ফুলের একটা ঝোপের পাশেই পড়ে আছে এক চাবড়া কুচকুচে কালো
লোম।

‘ভালুক?’

প্রশ্নটা আপনা থেকেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

‘গ্রেস্ট আনলাইকলি’, সামারভিল মন্তব্য করল। আমিও জানি এ-তল্লাটে
ভালুক থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই।

সামারভিল ইতিমধ্যে এক গোছা কালো লোম হাতে তুলে নিয়েছে। লক্ষ
করলাম লোমগুলো প্রায় এক বিঘত লম্বা এবং অস্বাভাবিক রকম রূক্ষ।

আরো দশ পা এগোতেই জানোয়ারের মাথার দিকটা চোখে পড়ল। যদিও
মাথার খানিকটা অংশ শকুনিরা খুবলে খেয়ে নিয়েছে, তবু সেটা যে ব্যাঘ শ্রেণীর
কোনো জানোয়ার সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না।

আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে একটা শকুনি ডানা ঝটপটিয়ে লাফিয়ে এক পাশে
সরে যাওয়াতে জানোয়ারের শরীরের আরো খানিকটা অংশ দেখা গেল। পাঁজরার
হাড়, ও তারই আশেপাশে লেগে থাকা মাংস আর ঘন কালো লোমে ঢাকা
চামড়া। শকুনিগুলো দিব্যি ভোজ মেরে চলেছে। ক্রীট দ্বীপে প্যান্থার বা ওই
জাতীয় কোনো জানোয়ারের মাংস কি এরা কোনোদিন খেয়েছে? মনেতোহয় না।
প্যান্থার কথাটা যদিও ব্যবহার করছি, কিন্তু আমি জানি যে কম্পিন্কালেও কোনো
প্যান্থারের লোম এত বড় বা এত রূক্ষ হয় না।

সামারভিলও অগত্যা বলল, ‘ব্যাঘ শ্রেণীর একটি আনকোরা নতুন
জানোয়ার—এছাড়া আর কিছু বলা যায় না একে।’

‘কিন্তু এটাকেই কি বন্দুক দিয়ে মারা হয়েছিল?’

‘তাইতো মনে হয়; তবে ডিমেট্রিয়াস মেরেছিলেন কিনা সেটাই প্রশ্ন।’

বাড়ি ফিরে এসে মিখাইলিকে জন্মটার কথা বলতে সে অবাক হয়ে গেল।
‘কালো জন্ম? বাধের মতো দেখতে? এক কালো বেড়াল আর কালো কুকুর
ছাড়া আর কোনো কালো জন্ম এদিকটায় কখনো দেখেছি বলেতোমনে পড়ে না।’

সন্ধ্যাবেলা ডিমেট্রিয়াসের শোবার ঘরের রাইটিং ডেস্ক থেকে একটা মূল্যবান
জিনিস পাওয়া গেল। সেটা হল একটা ডায়ারি। চামড়ায় বাঁধানো বকবকে নতুন

ডায়ারি, তাতে জানুয়ারি মাসের ২রা এবং ৩রা তারিখের পাতায় ডিমেট্রিয়াসের
হাতে গ্রীক ভাষায় লেখা দুটো মন্তব্য রয়েছে। আমরা দুজনে মিলে সে দুটোর
মানে করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। সামান্য হলেও, সে লেখা যেমন
রহস্যময় তেমনিই কৌতুহলোদীপক। ২রা জানুয়ারির লেখাটা বাংলা করলে এই
দাঁড়ায়—

‘আমার জীবনে সব সময়ই দেখেছি যে আনন্দের কারণ এবং উদ্বেগের কারণ
একই সঙ্গে পাশাপাশি ঘোরাফেরা করে। তাই সাফল্যেও শান্তি নেই। অগ্রপশ্চাত
বিবেচনা না করে আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় হাত দেব না। যাই হোক, আমার এই
ভুলের মাশুল আমাকেই দিতে হবে। বাবার বন্দুকটা বার করতে হবে। সেই
ছেলেবেলায় এয়ারগান ছুঁড়েছি, ভালো টিপ ছিল। এখনো আছে কি?’

‘বাবার বন্দুক’ সম্বন্ধে সামারভিলকে জিগ্যেস করতে ও বলল ডিমেট্রিয়াসের
বাবা নাকি বিখ্যাত শিকারী ও পর্যটক ছিলেন, এবং আফ্রিকার জঙ্গলে নাকি বিস্তর
ঘোরাফেরা করেছেন। এখন বুঝতে পারছি বৈঠকখানার মেবেতে পাতা সিংহের
ছালটা কোথেকে এসেছে। ৩রা জানুয়ারির পাতায় লেখা—

‘ক্লোস্স শহরের সেই মেলায় আজ থেকে দশ বছর আগে এক বেদে বুড়ি
আমার ভবিষ্যৎ বলেছিল। তার মতে আমার পঁয়ষষ্ঠি বছরের জন্মতিথিতে নাকি
একটা মন্ত বড় ফাঁড়া আছে, সেটা নাকি কাটানো মুশকিল হবে। পঁয়ষষ্ঠি হতে
আর মাত্র ১৬ দিন বাকি। অর্থাৎ ১৯শে জানুয়ারি। বুড়ির অন্য
ভবিষ্যাদ্ধানীগুলো সবই ফলেছে, তাই এটাও ফলবে বলে মেনে নিতে পারি।
হ্যাত আমি যে পরীক্ষাটা করতে যাচ্ছি তাতেই আমার মৃত্যু হবে। হয় হোক।
যদি মরার আগে পরীক্ষায় সফল হতে পারি তাহলে মরতে কোনো আপসোস
নেই। কিন্তু এই জনবহুল ক্ষুদ্রায়তন ক্রীট দ্বীপ আমার পরীক্ষার পক্ষে মোটেই
উপযুক্ত জায়গা নয়। আমার চাই বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর। আমার চাই—সাহারা।’

‘সাহারা’ কথাটার তলায় দুবার মোটা করে লাইন টানা আছে। কায়রো যাবার
কারণটা এ থেকে পরিষ্কার হচ্ছে; কিন্তু পরীক্ষাটা যে কী এবং তার জন্য
মরুভূমির কেন প্রয়োজন সে বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। সেবি
কায়রোয় গিয়ে যদি কিছুটা আলোর সন্ধান পাওয়া যায়।

১৫ই জানুয়ারি বিকেল ৫টা

কায়রো। আমরা দুজনে আলহাম্ব্ৰা হোটেলেই উঠেছি। হোটেলের খাতায়
নাম লেখার সময় ডিমেট্রিয়াসের নামটাও চোখে পড়ল। ৪ঠা জানুয়ারি সে যে
সত্যই এই হোটেলে এসে উঠেছিল তার চাকুষ প্রমাণ পাওয়া গেল। নামটা
দেখেই সামারভিল একটা পাকা গোয়েন্দার মতো কাজ করে ফেলল; ডিমেট্রিয়াস

যে ঘরে ছিলেন—অর্থাৎ ৩১৩ নম্বর ঘর—সেই ঘরটাই আমাদের থাকার জন্য চেয়ে বসল। সৌভাগ্যক্রমে ঘরটা খালিই ছিল, কাজেই পেতে অসুবিধা হল না। সে-ঘরে ডিমেট্রিয়াসের কোনো চিহ্ন পাওয়া যাবে এটা আশা করা ব্যথা, কারণ গত এগারো দিনে অনেকেই সে ঘরে থেকে গেছে এবং অনেকবারই সে-ঘর ঝাড়পোছ হয়েছে। কিন্তু তাও দেখলাম যে শেষ পর্যন্ত লাভই হল। এ ঘরের যে কুম-বয়—অর্থাৎ যে ছেক্রাটি কিছুক্ষণ আগে আমাদের বিছানাপত্র গোছগাছ করে দিয়ে গেল—তার সঙ্গে কথা বলে কিছু তথ্য সংগ্রহ হয়েছে। সামারভিলই পথর পশ্চাৎ কুল ছেলেটিকে।

‘କୁଦିନ କାଜ କରଛ ଏ-ହୋଟେଲେ ?’

‘চাব বড়ুৰ ।’

‘এ ঘরে যারা এসে দু’একদিন থেকে চলে যায় তাদের কথা মনে থাকে
তোমার?’

‘যাবা যাবাৰ সময় ভালো বকশিশ দেয় তাদেৱ কথা মনে থাকে বৈ কি !’

বুঝালাম ছোকরা বেশ রসিক। সামাজিক বলল, ‘দিন দশেক আগে একজন
গীক ভদ্রলোক এ ঘরে এসে এক বাত ছিলেন। বৈজ্ঞানিক। সঙ্গে একটা কালো
সুটকেস। পাঁচ ফুটের বেশি হাইট নয় ভদ্রলোকের। বছর পঁয়ষষ্ঠি বয়স, মাথায়
টাক যেটুক চল আছে কাঁচা, ঘন কালো ভুরু, টিকোলো নাক—মনে পড়ছে ?’

ডিমেট্রিয়াসকে যদিও দেখিনি, ইরাক্সিয়নে তাঁর বাড়ির বৈঠকখানায় ম্যান্টলপিসে তাঁর একটা বাঁধানো ফোটো দেখে তাঁর চেহারাটার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।

କୁମ-ବ୍ୟ ହେସେ ବଲଲ, ‘ପିଚାତ୍ତର ପିଯାନ୍ତ୍ର ବକଶିଶ ଦିଯେ ଗେଲେନ, ଥାକବେ ନାମନେ ?’

ପ୍ରଚାନ୍ଦର ପିଯାନ୍ତ ମାନେ ପଣେରୋ ଟକା । କୁମ୍ବ-ବୟେର ଖଣ୍ଡ ହବାରଇ କଥା ।

‘ভদ্রলোকতোমাত্র একরাত ছিলেন, তাই না?’ সামারভিল জিগ্যেস করল।
 ‘হাঁ’; আর তার মধ্যেও বেশির ভাগ সময়ই তাঁর দরজার বাইরে ‘ডু নট
 ডিস্ট্রিব’ নোটিশ টাঙানো থাকত।’

‘এখান থেকে উনি কোথায় যাবেন সেটা কিছি বলেছিলেন কি?’

‘আমাকে উটের কথা জিগ্যেস করেছিলেন। বললেন উটের পিঠে চড়ে
মরুভূমিতে যাবেন, উট কোথায় ভাড়া পাওয়া যায়। আমি বললাম, এল গিজা
থেকে ক্যারাভানের রাস্তা আছে—হাজার মাইল চলে গেছে মরুভূমির মধ্য
দিয়ে। এল গিজায় গেলে উট ভাড়া পাওয়া যাবে।’

କୁମ-ବୟେର କାହିଁ ଥିଲେ ଏର ବେଶି କିନ୍ତୁ ଜାନା ଯାଇନି । ତାବେ ଗିଜାର ଖୁବଟା

জরুরী। নাইল নদীর পূর্ব দিকে কায়রো শহর, আর রিজ পেরিয়ে পশ্চিমে হল গিজা—বিখ্যাত পিরামিড ও ফিল্ডসের জায়গা। গিজা আমার আগেই দেখা ছিল, যদিও ক্যারাভ্যানের রাস্তা ধরে উটের পিঠে চড়ে মুঝ অভিযানের অভিজ্ঞতা আমার নেই। আজকের দিনটা কায়রো শহরে ডিমেত্রিয়াস সমষ্টি আরেকটু খৌঁজখবর করে কাল সকালে গিজায় যাবো স্থির করলাম।

১৬ই জানুয়ারি, দুপুর সাড়ে বারোটা

ପ୍ରାୟ ପାଁଚଶୋ ଡଟେର ଏକଟା କ୍ୟାରାଭ୍ୟାନେର ସଙ୍ଗେ ଆମରା ଚଲେଛି ମରୁପଥ ଦିଯେ ବାହାରିଯା ଓ ଯେସିମେର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ । ଯାତ୍ରୀଦେର ସକଳେଇ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବସାଦାର—ଶହରେ ତୈରି ପଶମର ଜାମାକାପଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିସ ନିୟେ ଏବା ବାଣିଜ୍ୟ କରତେ ଚଲେଛେ ଗଭୀର ମରୁଦେଶର ଗ୍ରାମଧଳେ । ଏହି ସବ ଜିନିସେର ବଦଳେ ଓରା ନିୟେ ଆସବେ ପ୍ରଧାନତ ଖେଜର । ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚଲେ ଆସଛେ ଏକେବାରେ ଆଦିକାଳ ଥେକେ ।

দশ মিনিট হল আমরা একটা মনোদ্যান বা ওয়েসিসের ধারে থেমেছি বিশ্বাসের জন্য। এ অপ্পলটা একটা উপত্যকা। দিগন্ত বিস্তৃত বালির ফাঁকে ফাঁকে চুনা পাথরের টিলা মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। আমাদের কাছেই একটা জলাশয়, আর সেটাকে ঘিরে কয়েকটা খেজুর গাছ আর বেদুইনদের তাঁবু। এছাড়া রয়েছে মিশরের প্রাচীন সভ্যতার কিছু নমুনা। জলাশয়ের ওপারে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা বৌধহয় একটা মন্দিরের ভগ্নশূল্প। আমার পাশেই রয়েছে একটা মাথাভাঙ্গ থাম, সেটার ছায়ায় বসে আমি ডায়রি লিখছি।

আমরা হোটেল থেকে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়েছি সকাল সাড়ে সাতটায়।
গিজা পৌছতে লাগল আধ ঘণ্টা। যেখানে উট ভাড়া করলাম, তার কাছেই রাস্তার
ধারে এক সারি দোকান, তার মধ্যে এক বৃক্ষ খেজুর বিক্রেতার কাছে
ডিমেট্রিয়াসের খবর পাওয়া গেল। আমি আরবী ভাষা জানি, তাই একে ওকে
ডিমেট্রিয়াসের বর্ণনা দিয়ে তাঁকে দেখেছে কিনা জিগ্যেস করছিলাম। তাদের মধ্যে
একজন ওই বুড়ো ফলওয়ালাকে দেখিয়ে বলল, ‘ওকে জিগ্যেস করে দেখুন, ও
জানতে পারে।’ খেজুরওয়ালাকে প্রশ্ন করতেই সে হাত নেড়ে চোখ রাঙিয়ে
অকথ্য ভাষায় ডিমেট্রিয়াসকে উদ্দেশ করে গাল পাড়তে লাগল। কী ব্যাপার
জিগ্যেস করাতে শেষটায় সে বলল, ডিমেট্রিয়াস তার কাছ থেকে খেজুর কিনে যে
পয়সা দিয়েছিল, তার মধ্যে নাকি দুটো গ্রীক লেপটা ছিল। বুড়ো চোখে ভালো
দেখে না তাই বুঝতে পারেনি। পরে জানতে পেরে খৌজ করে দেখে সাহেব
উধাও। শেষ পর্যন্ত তার বাক্যস্মৃত বন্ধ করার জন্য সামারভিল তাকে ছানীয়
পয়সা দিয়ে তার ক্ষতি পূরণ করল। বুঝতে পারছি গিজায় এসে ভুল করিনি।
ডিমেট্রিয়াস এখান থেকেই উট নিয়ে মুকুতুমির উদ্দেশে যাত্রা করেছে। কিন্তু সে

কি যাত্রীদলের সঙ্গেই গেছে, না মাঝপথে মোড় ঘুরে নিজের খেয়াল মতো রাস্তা নিয়েছে ?

আমি সঙ্গে করে আমার কিংবদন্তো বড়—বটিকা ইণ্ডিকা—নিয়েছিপনেরো দিনের মতো । আশা করি তার মধ্যেই আমাদের কাজের শেষ হয়ে যাবে, এবং আশা করি ডিমেট্রিয়াসকে আমরা জীবিত অবস্থাতেই পাব । বেদেবুড়ির কথাটা জেনে অবধি মন্টা খচ করছে । এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী অনেক সময় ফলে যায় সেটা আমিও দেখেছি, যদিও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে এর কারণ এখনো স্থির করতে পারিনি । ১৯শে জানুয়ারি ডিমেট্রিয়াসের জন্মতিথি । আর ওই একই দিন ওর ফাঁড়া । আজ হল ১৬ই...

১৭ই জানুয়ারি, সন্ধ্যা সাড়ে ছটা

আমার থারমোমিটার বলছে কন্কনে শীত—অর্থাৎ একত্রিশ ডিগ্রী ফাৰেনহাইট—কিন্তু এয়ার কণিশনিং পিল ব্যবহার কৰার জন্য আমরা দুজনেই সাধাৰণ সুতোৰ পোশাকে চালিয়ে নিতে পারছি ।

কতখানি পথ এসেছি এই ছত্রিশ ঘণ্টায় জানি না । আন্দাজে মনে হয় শ'খানেক মাইল হবে । আজকের মতো আমাদের যাত্রা শেষ হয়েছে । রাতটা বিশ্রাম কৰে কাল সকালে আবাৰ রওনা দেব । মৰুভূমিৰ দল ধুনি জালিয়ে তাঁবু ফেলে বসেছে । উটগুলো ঘাড় উঁচু কৰে গন্তীৰ ভাবে জাৰিৰ কাটছে, আৰ মাৰো মাৰো হ্ৰোক্ষনিৰ মতো বিকট শব্দ কৰছে । শেয়ালেৰ ডাকও শোনা যাচ্ছে মাৰো মাৰো । এবাৰ মনে হল একটা হাঁটনার হাসি শুনলাম । পথে আসাৰ সময় ৰোপঘাড়েৰ ভেতৰ থেকে খৰগোশ আৰ একৰকম ধাঢ়ি ইঁদুৰ মাৰো মাৰো ৰেৱোতে দেখা যায় । সাপ এখনো চোখে পড়েনি । দিনেৰ আকাশে বাজ আৰ চিল উড়তে দেখেছি । এছাড়া আৰ কোনো পাখি নজৰে পড়েনি ।

আমাদেৱ তাঁবু আমৰা সঙ্গেই এনেছি । আপাতত তাৰ ভিতৱে বসে আমৰা দুজনে আমাৰই তৈৰি লুমিনিম্যাক্স আলোৰ সাহায্যে কাজ কৰছি । ন্যাফথালিনেৰ বলেৱ মতো দেখতে এই আলোয় দেশলাই সংযোগ কৰলেই প্ৰায় দুশো ওয়াট পাওয়াৱেৰ আলো ৰেৱোয় । একটা বলে একৰাতেৰ কাজ চলে । সঙ্গে স্টক আছে যথেষ্ট ।

আজ বিকেল চাৰটে নাগাদ পথে যে ঘটনাটা ঘটল এবাৰ সেটাৰ কথা বলি ।

আজ সাৱা দুপুৰই আবহাওয়াটা বেশ গুমোট ছিল—যদিও গৱাম নয় মোটেই । গুমোট ভাৰ দেখে, এবং পশ্চিমেৰ আকাশে খানিকটা মেঘ জমেছে দেখে, আমিতো ভাৰছিলাম হয়ত বা বৃষ্টি হবে, কাৰণ এখানে বছৱে যে তিন চাৰদিন বৃষ্টি হয়, সেটা শীতকালে হয় । কিন্তু শেষ পৰ্যন্ত বৃষ্টি হল না । তাৰ বদলে যে দিকে মেঘ

জমেছিল সেদিক থেকে একটা হাওয়া দিতে শুৰু কৰল, আৰ সেই হাওয়াৰ সঙ্গে সঙ্গে কানে একটা শব্দ ভেসে এল । শব্দটা এই মৰুভূমিৰ পৰিৱেশে যেমনি অস্তুত তেমনি অপ্রত্যাশিত । দুম—ধুপ...দুম—ধুপ...দুম—ধুপ... । যেন কোথাও একটা অতিকায় দামামার তালে তালে ঘা পড়ছে ! শব্দটা এতই গন্তীৰ যে তেমন আওয়াজ বার কৰতে হলে দামামার আয়তন হওয়া উচিত অস্তত একখানা পিৰামিডেৰ সমান ।

কিছুক্ষণ চলার পৱেই বুৰলাম যে শব্দটা শুধু আমার কানেই পৌঁছায়নি ; যাত্রীদেৱ অনেকেই সেটা শুনেছে, এবং তাৰ ফলে তাৰেৰ মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্যেৰ সৃষ্টি হয়েছে । শুধু মানুষ নয়—উটেৱ মধ্যেও যেন একটা সন্তুষ্ট ভাৰ লক্ষ কৰলাম । গোটা দশেক উট তোয়াত্রী-সমেত ল্যাগব্যাগ কৰে বালিৰ উপৰ বসেই পড়ল । এদিকে বাতাস বয়ে চলেছে, আৰ তাৰ সঙ্গে শব্দও হয়ে চলেছে—দুম—ধুপ...দুম—ধুপ...দুম—ধুপ... । হিসেব কৰে দেখলাম যে প্ৰথম দুটো আঘাতেৰ মাবাখানে তিন সেকেণ্ডেৰ তফাত, আৰ তাৰ পৰি পাঁচ সেকেণ্ডেৰ একটা ফাঁক । এই ভাৰেই, এই ছন্দেই, ক্ৰমাগত হয়ে চলেছে শব্দটা ।

আমৰা দুজনেই উটেৱ পিঠ থেকে নেমে পড়লাম । সামাৱিলিকে বললাম, ‘কী বুৰাচ ?’ সামাৱিলি কিছুক্ষণ কান পেতে শুনে বলল, ‘আওয়াজটা মনে হয় মাটিৰ তলা থেকে আসছে ।’ আমাৰও সেই রকমই মনে হচ্ছিল । শব্দটায় তেজ আছে, গান্তীৰ্য আছে, কিন্তু স্পষ্টতাৰ অভাৱ । সেটা যে কতদূৰ থেকে আসছে তাৰ বোৰাৰ কোনো উপায় নেই । এদিকে যাত্রীদেৱ মধ্যে বেজায় সোৱগোল পড়ে গেছে । একটি বুড়ো পশমওয়ালা—তাৰ গায়েৰ রং তামাটে আৰ মুখে অসংখ্য বলিৱেখা—আমাৰ কাছে এসে দানব দৈত্যেৰ কথা বলতে লাগল ; একেবাৱে খাস আৱৰ্যোপন্যাসেৰ কাহিনী । শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে সে আমাদেৱই দুজনকে অপয়া প্ৰতিপন কৰার চেষ্টায় একটা বিশ্রী প্ৰপাগাণ্ডা শুৰু কৰে দিল । প্ৰায় সাত আটশো লোক, হঠাৎ যদি তাৰেৱ মাথায় ঢোকে যে আমৰা দুজন তাৰেৱ যাত্রাপথে অমঙ্গলেৰ সূচনা কৰছি, তাহলে আৰ রক্ষা নেই ।

এদিকে আমি বুৰাতে পাৱছিলাম যে হাওয়াটা কমে আসছে, এবং সেই সঙ্গে শব্দটাও ক্ষীণ হয়ে আসছে । তৎক্ষণাৎ স্থিৰ কৰলাম যে এই সুৰ্বণ সুযোগটা হাতছাড়া কৰা চলবে না । শব্দেৱ দিকে মুখ কৰে দাঁড়িয়ে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে, নানা অঙ্গভঙ্গি কৰে তাৰম্বৰে একটাৰ পৰি একটা সংকৃত উন্টুট শোক আওড়াতে শুৰু কৰলাম । পাঁচ নম্বৰ শোকেৱ মাবাখাবি এসে হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল । আৰ সেই সঙ্গে শব্দটাও । বলা বাহলা, এৰ পৰি যাত্রীদেৱ মধ্যে কেউ আৰ আমাদেৱ পিছনে লাগতে আসেনি ।

কিন্তু এটা স্বীকাৰ না কৰে উপায় নেই যে শব্দটা আমাদেৱ দুজনকেও ভাৱি

অবাক করে দিয়েছে। অবিশ্ব এটার সঙ্গে ডিমেত্রিয়াসের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। সামারভিলের ধারণা ওটা বেদুইন বা ওই জাতীয় কোনো স্থানীয় আদিবাসীর ঢাক বা ড্রামের শব্দ—মরুভূমির খামখেয়ালি আবহাওয়ায় ম্যাগনিফিইড হয়ে একটা অস্বাভাবিক গুরুগন্তীর চেহারা নিয়েছিল। আবহাওয়ায় ম্যাগনিফিইড হয়ে একটা অস্বাভাবিক গুরুগন্তীর চেহারা নিয়েছিল।

১৮ই জানুয়ারি, সকাল সাড়ে দশটা

আমাদের দুজনকে বাধ্য হয়ে দলচ্ছুত হতে হয়েছে। অর্থাৎ ক্যারাভ্যান চলে গেছে দক্ষিণ-পশ্চিমে বাহারিয়া ওয়েসিসের বাঁধা রাস্তায়, আর আমরা চলে এসেছি পথ ছেড়ে উত্তর দিকে। কেন এমন হল সেটা বলি।

আজ ভোর ছ'টা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত একটানা চলার পর হঠাতে লক্ষ করলাম রাস্তার ডান দিকে প্রায় দুশো গজ দূরে একটা বালির টিবির উপর এক পাল শকুনি। দেখেই কেন জানি বুকের ভিতরটা ছাঁত করে উঠল। পিছন ফিরে সামারভিলের দিকে চেয়ে দেখি তারও দৃষ্টি ওই শকুনিরই দিকে। ক্যারাভ্যান চলেছে সেটার পাশ কাটিয়ে, অথচ একটা অদম্য কৌতুহল হচ্ছে এগিয়ে গিয়ে দেখি শকুনিগুলো কিসের মাংস খেতে এত ব্যস্ত। আমার সঙ্গে যে উটওয়ালাটা ছিল তাকে মতলবটা জানলাম। বললাম, দল ছেড়ে শকুনিগুলোর দিকে যাবো, তারপর আবার ফিরে এসে দলে যোগ দেব; তাতে তোমার আপত্তি আছে কি?

লোকটা এক কথায় রাজী হয়ে গেল। বুঝলাম, আমার গতকালের অভিনয়ে কাজ দিয়েছে, এরা আমাকে একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ বলে ঠাউরে নিয়েছে। সামারভিল ও আমি উট ও উটওয়ালা সমেত দল ছেড়ে ডানদিকে ঘুরলাম।

মিনিট পাঁচক পরে টিবির কাছে পৌঁছে আমাদের কৌতুহল মিটল। শকুনিরা যেটাকে ছিড়ে থাক্কে সেটা হল উটের মস্তদেহ।

কিন্তু শুধু তাই কি? তার পাশেই যে আরেকটা লাশ পড়ে আছে সেটাতো জানোয়ারের নয়, সেটা মানুষের। আমাদের সঙ্গে যে লোকদুটো রয়েছে, এও তাদেরই মতো একজন উটওয়ালা। বোঝাই যাচ্ছে যে উট সমেত এই উটওয়ালা আরেকটি ক্যারাভ্যান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে এখানে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। আপনা থেকেই মরেছে কি? নাকি কেউ তাদের হত্যা করেছে?

শকুনির দল থেকে দশ হাত দূরে বালির উপর ওটা কী পড়ে আছে?

উট থেকে নেমে হেঁটে একটু এগিয়ে যেতেই প্রশ্নের উত্তর পেলাম। দুপুরের রোদে যেটা চক্ক করছিল সেটা একটা বন্দুকের নল; বাঁটের দিকটা বালির



নিচে। বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে দেখি সেটা একটা জার্মান মাউজার রাইফেল। এই রাইফেলের গুলিতেই যে এ দুটি প্রাণীর জীবনাবসান হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, এবং মন বলছে যে আততায়ী হলেন স্বয়ং প্রোফেসর হেক্টর ডিমেত্রিয়াস, যিনি এই একই মাউজার বন্দুক দিয়ে ক্রীট দ্বীপের সাইলোরিটি পাহাড়ের গায়ে ঝাউ বনের ভিতর সেই নাম-না-জানা ব্যাঘজাতীয় লোমশ প্রাণীটিকে হত্যা করেছিলেন।

আরো বোঝা যাচ্ছে যে এই মৃত উটওয়ালার এই মৃত উটের পিঠে চড়েই ডিমেত্রিয়াস তার অভিযানে বেরিয়েছিলেন। এই পর্যন্ত এসে তাঁর বাহকের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়—তাই তাকে মেরে ফেলেন। এর পর ডিমেত্রিয়াস যেখানেই গিয়ে থাকুন, তাঁকে পায়ে হেঁটেই যেতে হয়েছে।

আমাদের উটওয়ালা দুটির দিকে চেয়ে মায়া হল। তাদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তার কারণ যে শুধু এই হত্যার দশ্য, তা নয়; কিছুক্ষণ থেকেই মাঝে মাঝে একেকটা দমকা পশ্চিমা বাতাসের সঙ্গে আবার শুনতে পাচ্ছি সেই দামামার শব্দ—দুম—ধুপ...দুম—ধুপ...দুম—ধুপ...।

বুঝতে পারলাম যে ওই আওয়াজ লক্ষ্য করেই আমাদের এগোতে হবে, এবং

সন্তুষ্ট হলে উটের পিঠেই যেতে হবে। মন এখন বলছে ওই শব্দের সঙ্গে ডিমেট্রিয়াসের একটা সম্পর্ক রয়েছে।

সামারভিলকে বলতে সে বলল, ‘আমি ও সেই কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু এবার আর তুমি ভেলকি দেখাতে চেষ্টাকোরোনা; যেভাবে ঘন ঘন বাতাস বইছে, তাতে ওই শব্দ সহজে থামবে বলে মনে হয় না। উটওয়ালারা এমনি বললে বোধহয় যেতে রাজী হবে না। দেখ যদি টাকার লোভ দেখালে কিছু হয়।’

টাকায় কাজ হল, তবে অল্পে নয়, এবং বেশ কিছুটা আগাম দিতে হল। গত তিন ঘণ্টা ওই শব্দ লক্ষ্য করে আমরা পশ্চিম দিকে এগিয়েছি। একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখে উট থামিয়ে নামতে হয়েছে। চারিদিকে ধূ ধূ করছে মরুভূমি, আর তার মাঝখানে স্বর্গের দিকে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা পিরামিড সদৃশ বালির ঢিপি। হাইটে গিজার পিরামিডের চেয়ে বেশি বই কম নয়।

আমরা টিপিটার থেকে বেশ কিছুটা দূরেই ক্যাম্প ফেলেছি। আরো কাছে গেলে হয়ত ওটার আয়তনের আরো সঠিক আন্দাজ পাবো। মরুভূমিতে আন্দাজ করা ভারী কঠিন। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে ওই বালির নিচে যদি প্রাচীন ইজিপ্যায় সভ্যতার কোনো অতিকায় নির্দশন লুকিয়ে থাকে, তাহলে আমরাই হব তার প্রথম আবিষ্কর্তা। বালি না-সরা পর্যন্ত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। উটওয়ালা দুটোকে জিগেস করে দেখেছি। তাদের মুখে কথাই সরছে না। বোধহয় অবিরাম দামামাধ্বনিতে তাদের বাক্যরোধ হয়েছে। এখন থেকে সব সময়ই সেই দামামাধ্বনিতে তাদের বাক্যরোধ হয়েছে। এখন থেকে সব সময়ই সেই শব্দটা শব্দটা শোনা যাচ্ছে, বাতাসের উপর আর নির্ভর করছে না সেটা! বলা যায় সে শব্দটা যেন এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের একটা অঙ্গ। এক ঘণ্টা হল আমরা এখানে এসেছি, তার মধ্যে একবারও শব্দটা থামেনি বা তার ছন্দপতন ঘটেনি। শুনলে মনে হয় যেন শব্দটা চিরকালই ছিল, এবং চিরকালই থাকবে।

বালির পাহাড়টা সম্পর্কে সামারভিলেরও ধারণা যে ওটা আসলে একটা প্রাচীন স্তুতি বা মন্দির জাতীয় কিছু। আমরা ঠিক করেছি যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তারপর পাহাড়টার কাছে গিয়ে ওটার চারিদিকে ঘুরে ভালো করে অনুসন্ধান করব। শব্দটা সম্বন্ধে কিন্তু ওরও আমারাই মতো হতভম্ব অবস্থা। তবে একটা কথা ও ঠিকই বলেছিল—শব্দটা মাটির নীচে থেকেই আসছে। আমরা বালিতে কান পেতে সেটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। এইভাবে ক্রমাগত রাবুণে দুরমুশের শব্দে আমাদের কাজের ব্যাঘাত হতে পারে। দেখা যাক কী হয়, কপালে কী আছে!

পশ্চিমে আবার মেঘ করেছে। অল্প অল্প বাতাসও বইছে, আর তার সঙ্গে বালি।

১৮ই জানুয়ারি, বিকাল চারটা

প্রচণ্ড বালির বাড়ে আমাদের তাঁবু প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তারই মধ্যে আবার ভূমিকম্প।

কিন্তু এই কাঁপুনির মধ্যেও একটা বিশেষত লক্ষ করলাম। দোলাটা সাধারণ ভূমিকম্পের মতো এপাশ ওপাশ নয়। প্রথম ধাক্কাতেই মনে হল পায়ের তলা থেকে ভূখণ্ডের খানিকটা অংশ যেন আচমকা স্থান পরিবর্তন করল, আর তার ফলে আমরা সব কিছু সমেত বেশ খানিকটা নিচের দিকে চলে গেলাম। একজন লোক চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় তার তলা থেকে যদি সেটা হঠাতে টেনে নেওয়া যায়, তাহলে যা হয়, এটাও ঠিক তাই। প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় মাঝে মাঝে একটা ঘড় ঘড় করে শব্দ হয় সেটা আমি জানি; আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে এ ব্যাপারে। কিন্তু আজকের কাঁপুনির সময় যে শব্দটা হল তেমন শব্দ আর কখনো হয়েছে কিনা জানি না। মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা যেন জ্যান্ত হয়ে যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। আমি যে আমি, আমারও কপালে ঘাম ছুটে গিয়েছিল। মুরাদ ও সুলেমান—আমাদের দুই উটওয়ালা—দুজনেই আতঙ্কে সংজ্ঞা হারিয়েছিল। ওযুধ দেওয়ার ফলে দুজনেরই অবশ্য জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু এরা আর কোনদিন কথা বলতে পারবে বলে মনে হয় না। উট দুটোও দেখছি একেবারে থুম মেরে গেছে। তারা আর জাবর কাটছে না, কেবল একদৃষ্টি ওই রহস্যময় পাহাড়টার দিকে চেয়ে আছে। ভূমিকম্পের চোটে পাহাড়টাও মনে হচ্ছে এক পাশে সামান্য কাত হয়ে গেছে। অবিশ্য সেটা আমার দেখার ভুল হতে পারে। হিসেবপত্র সব কেমন জানি গুলিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র যে জিনিসটা অপরিবর্তিত রয়েছে সেটা হল ওই দুম্দুম দামামাধ্বনি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যদি মনে হয় আর দুর্যোগের সম্ভাবনা নেই তাহলে আমরা দুজনে একবার বেরোব। পাহাড়টার আরেকটু কাছে না গেলে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

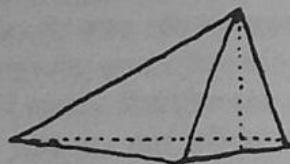
বিকাল সোয়া পাঁচটা

সেই অন্তুত মরুপর্বতের পাদদেশে বসে আবার ডায়ারি লিখছি।

তাঁবু থেকে এটাকে যত উঁচু মনে করেছিলাম, কাছে এসে তার চেয়েও অনেক বেশি উঁচু মনে হচ্ছে। এখানে দামামার শব্দে কান পাতা যায় না। সামারভিল ও আমি পরম্পরারের সঙ্গে হাতমুখ নেড়ে কথা বলার কাজ সারছি। তবে আশ্চর্য এই যে এহেন কর্ণপটাহবিদারক শব্দও দেখছি ক্রমে অভ্যাস হয়ে আসছে। এখন আর আগের মতো অসহ্য মনে হচ্ছে না, বা চিন্তার ব্যাঘাত হচ্ছে না।

প্রথমে পাহাড়টা কীরকম দেখতে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করি। এর পূর্বপাশটা

খাড়া উঠে গেছে উপর দিকে একেবারে চুড়ো পর্যন্ত। দূর থেকে দেখলে এটাকে একটা সমবাহু ত্রিভুজের মতো মনে হবে। চুড়ো থেকে পশ্চিম দিকে বালি নেমে এসেছে ঢালু হয়ে একেবারে জমি পর্যন্ত, যার ফলে উভৰ আৱ দক্ষিণে দুটো ত্রিভুজ দেয়ালের সৃষ্টি হয়েছে। একটু পাশ থেকে ছবি আঁকলে এইরকম দাঁড়াবে—

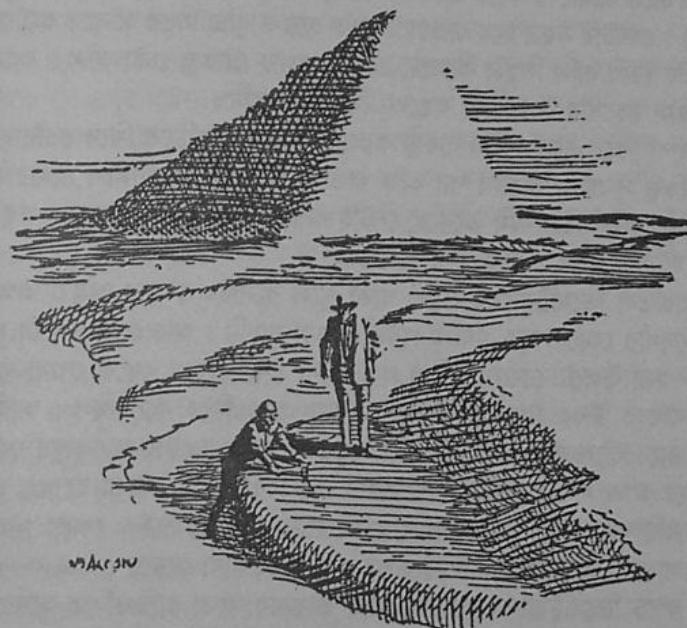


অর্থাৎ, এটাকে ঠিক পিৱামিড বলা চলে না ; এর চেহারায় একটা বিশেষত্ব আছে।

তাঁু থেকে পাহাড়ে আসাৰ পথে দুটো আশৰ্য জিনিস আবিক্ষাৰ হয়েছে। সামারভিল কিছু দূৰে বসে তাৱই একটাৰ নমুনা নিয়ে পৰীক্ষা কৰছে। বালিৰ উপৰ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্ৰথম যেটা চোখে পড়ল সেটা খয়েৰি রঙেৰ দড়িৰ মতন একটা জিনিস। বালি থেকে যেভাৱে জিনিসটা বেৰিয়েছিল, তাতে প্ৰথমে মনে হয়েছিল সেটা বুঝি শুকিয়ে যাওয়া উদ্ধিদ্বৃত্তিৰ জাতীয় একটা কিছু। কিন্তু কাছে এসে হাত দিয়ে পৰাখ কৰে বুবলালম তা নয়। দড়ি বললেও অবিশ্বিয় ঠিক বলা হয় না, কাৱণ তাৰ একেকটাৰ বেড়ে একটা ঘোটা বাঁশেৰ সমান। দুজনে অনেক টানাটানি কৰেও জিনিসটাকে স্থানচূত কৰা গেল না। শেষকালে সামারভিল ছুৱি দিয়ে খানিকটা অংশ কেটে সঙ্গে নিয়ে নিল পৰীক্ষা কৰাৰ জন্য।

যে জিনিসটা আমাদেৱ আৱো বেশি অবাক কৰল সেটা সন্তুত কোনো ধাতুৰ তৈৰি। জিনিসটাৰ রং হলকা লাল ; দেখে মনে হয় একটা বিৱাট চাকাৰ একটা পাশেৰ খানিকটা অংশ। এই সামান্য অংশ থেকেও চাকাৰ আয়তনেৰ একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। হিসেবে বলছে তাৰ পৰিধি অন্তত দুশো ফুট। অর্থাৎ তাৰ মধ্যে দিব্যি একটা আন্ত টেনিস কোর্ট চুকে যায়। এটাকেও অবিশ্বিয় হাত দিয়ে টানাটানি কৰে কোনো ফল হল না। এই মৰভূমিৰ পৰিবেশে এই অতিকায় ধাতবচক্র এতই অস্বাভাবিক, এবং প্ৰাচীন মিশ্ৰণৰ সঙ্গে এৱ সম্পৰ্ক এতই ক্ষীণ যে, এটা আমাদেৱ নতুন কৰে ভাবিয়ে তুলেছে। তাহলে কি ডিমেট্ৰিয়াস সাহাৱাৰ

গৰ্ভে একটি গবেষণাগার বা কাৱখনাজাতীয় কিছু স্থাপন কৰেছে—যাৰ সঙ্গে এই দড়ি ও এই চাকা যুক্ত ? এবং যাৰ যন্ত্ৰপাতি-কলকজাৰ শব্দ বাইৱে থেকে দামামাৰ শব্দেৰ মতো শোনাচ্ছে ? কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে এই ভৃগুভৃতি কাৱখনায় টেকাৰ দৱজা কোথায় ? ডিমেট্ৰিয়াসই বা সেখানে গেল কী কৰে ? আৱ এমন কি ভয়কৰ গোপন গবেষণায় সে লিঙ্গ থাকতে পাৱে যাৰ জন্য সাহাৱাৰ মতো জনমানবশূল্য প্ৰয়োজন হয় ?



পাহাড়েৰ পূৰ্ব পাশ, অর্থাৎ যে পাশটা খাড়াই উঠে গেছে, সে পাশ থেকে মাৰে মাৰে বালি খসে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। দেখে সন্দেহ হয় যে ভিতৰটা ফাঁপা—এবং তাৰ মধ্যে দিয়ে বায়ু চলাচলেৰ একটা রাস্তা রয়েছে। একবাৰ ওদিকটায় গিয়ে হাত দিয়ে বালি খুঁড়ে দেখলে কেমন হয় ?

সামারভিল তাৰ জায়গা ছেড়ে উঠেছে। ও পুৰ দিকটাতেই যাচ্ছে। ওৱ সঙ্গে যাওয়া দৱকাৰ। একজনেৰ যদি কিছু হয় তাহলে অন্যজনকে ভাৱী অসহায় হয়ে

পড়তে হবে।

বাত এগারোটা বেজে কুড়ি মিনিট

ଶ୍ରୀ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟାର ମଧ୍ୟେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚଯ ବାପାର ଘଟେହେ ।

গত পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আমির দুটি প্রথমেই বলি, আমি আর সামারভিল পাহাড়ের পুবদিকটায় গিয়ে প্রায় আধশস্তা ধরে হাত দিয়ে বালি সরিয়ে একটা গহুর বা সুড়ঙ্গের সন্ধান পেয়েছি। তার ভিতরে দুর্ভেদ্য অঙ্ককার। তীব্র উচ্চের আলো ফেলে দূরবীন দিয়ে দেখেও কুলকিনারা করা যায়নি। গহুরের মধ্যে থেকে ক্ষণে ক্ষণে প্রচণ্ড দমকা বাতাস বেরিয়ে এসে আমাদের কাজে রীতিমত ব্যাঘাতের সৃষ্টি করছিল। তবু আমরা হাল ছাড়িনি। শেষটায় সক্ষা হয়ে যাওয়াতে বাধ্য হয়ে তাঁবুতে ফিরে আসতে হয়েছে। কাল যদি দেখি বালি কিছুটা কমেছে, তাহলে গহুরে ঢোকার চেষ্টা করব। আমার দুটি বিশ্বাস রহস্যের উভয় এই গহুরের ভিতরেই রয়েছে।

ক্যাম্পে ফিরে এসে কফির ব্যবহাৰ কৱলাম। আমাৰ বাড়তে ঘদে তেষা দুহ
মেটে, কিন্তু সারাদিন কাজেৰ পৰ কফি খাওয়াৰ আনন্দটা মেটে না। সামাৰভিল
সঙ্গে কিছু ব্ৰেজিলিয়ান কফি এনেছে, সেটাই খাওয়া হচ্ছে। কফি সেবনেৰ পৰ যে
বিচিত্ৰ ঘটনাটা ঘটল সেটাৰ কথা বলি।

সামারভিল ডিমেট্রিয়াসের সবুজ খাতা খুলে বসেছিল। তার অন্তুত অক্ষরে অন্তুত লেখার কোনো স্মৃত এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আজও আধ ঘণ্টা ধরে খাতার পাতা উলটে কোনো সুবিধা করতে না পেরে চোখ থেকে চশমা খুলে খোলা খাতার উপর রেখে সামারভিল মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল। আমিও চিন্তিত ভাবে পাশে বসে সেদিনের সেই অন্তুত প্যানথার জাতীয় জানোয়ার থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত একটার পর একটা যত বিদ্যুটে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার কথা ভাবছিলাম, এমন সময় আমার চোখ পড়ল ডিমেট্রিয়াসের খোলা খাতার উপর। সামারভিলের চশমাটা তার উপর কাত করে রাখা রয়েছে। লক্ষ করলাম চশমার কাচে ডিমেট্রিয়াসের হাতের লেখা আয়নার মতো প্রতিফলিত হয়েছে। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকেই বুলাম সে লেখা আমি চিনতে পারছি, সে ভাষা আমার চেনা ভাষা। আর সে ভাষা গ্রীকও নয়, অন্য কিছুই নয়—একেবারে সহজ সরল ইংরিজি। এক মহুর্তে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

ব্যাপারটা আর কিছুই না—অন্য লোকে যাতে সহজে পড়তে না পারে তাই ডিমেট্রিয়াস ইংরিজি লিখেছে উল্টো করে—অর্থাৎ, ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। একে বলে Mirror writing। এর ফলে চেনা ভাষা হয়ে যায় দুর্বোধ্য সাংকেতিক ভাষা। অথচ আয়নার সামনে ধরলে সে ভাষা পড়তে আরকোনোই অস্বিধা হয় না। মনে পড়ল ইতালীর বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তাঁর

নোটবুকে এই mirror writing বাবহার করতেন

ଗତ ଏକ ଘନ୍ଟା ଧରେ ସାମାରଭିଲେର ଦାଡ଼ି କାମାବାର ଆୟନା ସାମନେ ରୋଖେ ଆମରା ଡିମେଟ୍ରିଆସେର ଲେଖାର ବେଶିର ଭାଗଟାଇ ପଡ଼େ ଫେଲେଛି । ଲେଖା ଥେକେ ଯା ଜାନା ଗେଲ ମୋଟାମଟି ଏହି—

ক্রীট দ্বীপের ক্লিনোস শহরে একটা পাঁচ হাজার বছরের পুরানো মন্দিরের ভগ্নাংশ থেকে ডিমেত্রিয়াস একটা পাথরে খোদাই করা লেখা পায়। সেটার মানে উদ্ধার করে সে জানতে পারে যে লেখাটা একটা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ওষুধের ফরমুলা। সে ওষুধ খেলে নাকি মানুষের শরীরে দেবতার শক্তি সঞ্চারিত হয়। ডিমেত্রিয়াস সেই ওষুধ তৈরি করার সংকল্প করেছিল, এবং লেখা পড়ে মনে হয় সফলও হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ১লা জানুয়ারি সে নাকি ফিলিঙ্গ নামে একজন কাউকে সে ওষুধ খাইয়ে পরিষ্কাও করেছিল। এই ফিলিঙ্গ বাণিজ্যিক যে কে সেটা কোথাও বলা নেই; তবে সামারভিল ও আমি দুজনেই জানি ফিলিঙ্গ মানুষের নাম হলেও, কথাটার আসল মানে হচ্ছে বেড়াল, অথবা বেড়াল শ্রেণীর কোনো প্রাণী। যেমন বাঘের ল্যাটিন নাম হল ফিলিস টাইগ্রিস। তাহলে কিন্তু আর লেখা সম্ভব নয়। বাইরে ঝড় আর তার সঙ্গে বৃষ্টি।...

২২শে জানুয়ারি...

ঘণ্টা দুয়েক হল কায়রোতে পৌঁছেছি। হাত কাঁপছে, তবুও টাটকা থাকতে থাকতে গত দুদিনের বিভীষিকাময় ঘটনার কথা লিখে রাখতে চাই। একটা পুরো দিন নষ্ট হয়েছে কারাভানের অপেক্ষায় বসে থেকে। আমাদের উট এবং দুজন উটওয়ালাই নিখৌজ, সম্ভবত মৃত। কাজেই আমাদের দুজনকে ক্ষত বিক্ষত অবসন্ন শরীরে বালির উপর দিয়ে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা হেঁটে তবে কারাভানের রাস্তায় আসতে হয়েছিল। আমার ওষুধের গুণে যা শুকিয়ে এসেছে, এমনকি সামারভিলের কনুইয়ের ভাঙা হাড়ও জোড়া লেগে গেছে; কিন্তু মনের অবস্থা মোটেই স্বাভাবিক নয়, হতেও পারে না। কী ভাগ্য ওষুধের শিশি, ডায়রি, কলম, মানিব্যাগ, ডুপলিকেট চশমা আর আনাইহিলিন পিস্তলটা আমার পকেটে ছিল। বাকি সব কিছুই—এমনকি ডিমেট্রিয়াসের খাতা পর্যন্ত—কোথায় যে তলিয়ে গেছে তার কোনো পাত্রাই নেই।

১৮ই জানুয়ারি রাত এগারোটার পর তাঁবুতে বসে ডায়রি লিখতে লিখতে হঠাৎ ঝড়বষ্টির সূত্রপাত হল সেকথা আগেই লিখেছি। এখানে বছরে মাত্র তিনচার দিন বৃষ্টি হয় বলেই কিনা জানি না, এমন চোখ ধীধানো মুষলধারা ও তার সঙ্গে ঝড়ের এমন দাপট আমি কখনো দেখিনি। তাঁবুর এক পাশের ক্যানভাস হাওয়ায় ফেঁপে উঠে ঝাপটা মেরে প্রথমেই আমার আলোটাকে দিল অকেজো করে। এদিকে

বাইরে দুর্ঘেগের ফলে উট দুটো বিকট চিংকার আরম্ভ করেছে ; আর মুরাদ ও সুলেমান বালি কামড়ে পড়ে তারস্বরে আল্লার নাম জপছে !

পৌনে বারোটা নাগাদ (আমার ঘড়ির কাঁটায় রেডিয়াম থাকায় কেবল সময়টাই দেখতে পাচ্ছিলাম) বড়ের শব্দ করে এলো । আমাদের তাঁবু আর দাঁড়িয়ে নেই । সেটা এখন আমাদের দুজনের গায়ে আঞ্চেপ্পেষ্টে জড়ানো, এবং আমরা প্রাণপণে সেটাকে আঁকড়ে ধরে আছি যাতে বৃষ্টি থামলে যেন আবার সেটাকে ছাউনি হিসাবে ব্যবহার করতে পারি ।

ঠিক বারোটার সময়ে একটা প্রচণ্ড বিদ্যুতের চমক হল, আর সেই সঙ্গে আরম্ভ হল প্রলয়কর ভূমিকম্প । প্রথম ধাকাতেই দেখলাম আমি আর মাটিতে নেই ; এক ঝটকায় কিসে যেন আমাকে ব্যাট দিয়ে মারা ক্রিকেট বলের মতো শূন্যে তুলে ফেলেছে । এই শূন্যপথে অন্তত পাঁচ সেকেন্ড ধরে প্রচণ্ড বেগে উড়ে গিয়ে আমি সজোরে হৃদ্দি খেয়ে পড়লাম বরফের মতো ঠাণ্ডা ভিজে বালির ওপর । আমার



মাথার উপর আর তাঁবুর আচ্ছাদন নেই, আমার পাশে সামারভিলও নেই । দুর্ভেদ্য অন্ধকার রাতে সাহারার একটা অংশে আমি একা বালিতে উপুড় হয়ে পড়ে বৃষ্টিবাণে বিন্দ হচ্ছি । সামারভিল কোথায়, সে বেঁচে আছে কিনা,—উট এবং উটওয়ালাগুলোই বা কোথায়, তারাই বা বেঁচে আছে কিনা, কিছু জানার উপায় নেই ।

হঠাতে আরেকটা ঝটকায় আমি আরো কিছুদূর গড়িয়ে গেলাম । তারপর ভূমি স্থির হল । ক্রমে বৃষ্টি থেমে গেল । তারপর সব চুপ, সব শব্দ বন্ধ ।

কোনো শব্দই নেই ? সেই দামামা-ধৰনি ?

না, তাও নেই । আশ্চর্য ! সেই কর্ণভেদী দূম দুম শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে । তার বদলে একটা অস্বাভাবিক শ্বাসরোধকারী নিষ্ঠকতা আমার বুকের উপর

চেপে বসেছে । কিন্তু ওই ভূগভোঘিত গুরুগভীর শব্দ হঠাতে বন্ধ হবার কারণ কী ?

মাথাটা একটু উঁচু করে চারিদিকে দৃষ্টি ঘূরিয়ে দেখলাম । অন্ধকার চলে গেছে । কিন্তু এত আলো হয় কী করে ? সব কিছুই এত স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে কী করে ?

হঠাতে খেয়াল হল—আকাশ পরিকার । একটা মাত্র হালকা টুকরো মেঘ চাঁদের উপর থেকে সরে যাচ্ছে । পূর্ণিমার চাঁদ ।

মেঘ সরে গেল । এখন পূর্ণ জ্যোৎস্না । এমন আশ্চর্য উজ্জ্বল চাঁদের আলো কখনো দেখিনি ।

ওটা কে—ওই বাঁ দিকে, বিশ হাত দূরে ? সামারভিল না ?

হ্যাঁ, সামারভিল । সামারভিল দাঁড়িয়ে আছে । আমি হাঁক দিলাম—‘আর্থার ! আর্থার !’

কোনো উত্তর নেই । সে কি কালা হয়ে গেছে ? না পাগল ? কিসের দিকে একদৃষ্টি চেয়ে আছে সে ?

আমারও দৃষ্টি সেই দিকে গেল । পাহাড়ের দিকে ।

পাহাড়ের উপর থেকে বালি সরে গেছে । কিন্তু তার তলা থেকে যেটা বেরিয়েছে সেটা কী ? আর পাহাড়ের ঢালু অংশটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে তার দুদিকে ঘন জঙ্গলটা কিসের ?

আমি সামারভিলের দিকে এগিয়ে গেলাম । দৃষ্টি পাহাড়ের দিক থেকে সরাতে পারছি না । অবাক বিশ্বয়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, কারণ আমি ক্রমে বুরাতে পারছি যে আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে যে বিশাল জিনিসটা, সেটা আসলে আমার চেনা । আর পুর দিকের খাড়াই অংশের গায়ে যে দুটো বিরাট গহুর, যাকে আমরা কারখানায় যাবার সুড়ঙ্গ বলে মনে করেছিলাম—সেটাও আমার চেনা । গহুর দুটো আসলে নাকের ফুটো, আর পাহাড়টা একটা শুয়ে থাকা মানুষের নাক, আর নাকের ঢালু অংশটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, তার দুপাশে জঙ্গলটা হচ্ছে ভূরু, আর তার নিচের প্রশস্ত ঢিপিটা হচ্ছে বন্ধ হওয়া চোখ !

‘ডিমেট্রিয়াস !’

সামারভিলের ফিসফিসে কঠস্বর সাহারার এই অপার্থিব জ্যোৎস্না-প্রাবিত দিগন্তবিস্তৃত নিষ্ঠকতার মধ্যে যেন প্রতিধ্বনিত হতে লাগল—

‘ডিমেট্রিয়াস !...ডিমেট্রিয়াস !...’

হ্যাঁ, ডিমেট্রিয়াস । ওই নাক আমি ছবিতে দেখেছি । ওই ভূরুও দেখেছি । ওই চোখ দেখেছি খোলা অবস্থায় । এখন বন্ধ, কারণ ডিমেট্রিয়াসের মৃত্যু হয়েছে । তার মুখেরই খানিকটা অংশ বেরিয়ে আছে বালির উপর, আর তার বুকের একটা অংশ । খয়েরী রঙের দড়িটা আসলে ওর গায়ের একটা লোম । আর সেই যে

জিনিসটা, যেটাকে একটা বৃত্তের অংশ বলে মনে হয়েছিল, সেটা আসলে হাতের একটা নখ।

‘ভূমিকস্পের কারণ বুঝতে পারছ?’ সামারভিল জিজ্ঞেস করল।
বললাম, ‘পারছি। ডিমেত্রিয়াস মতুশ্যয়ায় বালির নিচে ছটফট করছিল।’

‘আর দামামা-ধ্বনি?’
‘ডিমেত্রিয়াসের হাটবীট।—ডিমেত্রিয়াস তার ওষুধ প্রথমে তার বেড়াল ফিলিঙ্গের উপর পরীক্ষা করে। তার ফলেই অতিকায় বেড়ালের সৃষ্টি হতে চলেছিল, ডিমেত্রিয়াস বেগতিক বুঝে তার বাড়া বন্ধ করার জন্য বন্দুকের সাহায্য নিয়েছিল।’

‘কিন্তু তার নিজের বাড়াটা মাঝপথে বন্ধ হয় সেটা সে চায়নি। সে খাঁটি বৈজ্ঞানিকের মতোই জানতে চেয়েছিল তার ওষুধের দৌড় কতদূর।’
‘ঠিক বলেছ। তার নিজের বিশ্বাস ছিল সে অতিকায় মানুষে পরিণত হবে,
তাই তার পরীক্ষার জন্য দিগন্তহীন মরভূমির প্রয়োজন হয়েছিল।’
‘ক'তটা লম্বা হবে ডিমেত্রিয়াসের দেহটা সেটা আন্দাজ করে দেখেছ?’
‘ক'তটা লম্বা হবে ডিমেত্রিয়াসের দেহটা সেটা আন্দাজ করে দেখেছ?’
আমি বললাম, ‘নাকের পূর্ব দিকের অংশটা যদি আন্দাজ একশো ফুট উঁচু হয় তাহলে পুরো শরীরটা অস্তত তার ঘাটগুণ হওয়া উচিত।’

‘অর্থাৎ ছ'হাজার ফুট।’

‘অর্থাৎ এক মাইলেরও বেশি।’

সামারভিল একটা দীর্ঘশাস ফেলল।

‘তাহলে বেদে বুঝির কথা সত্যি হল।’

আমি বললাম, ‘অক্ষরে অক্ষরে। আজ উনিশে জানুয়ারী। দামামাধ্বনি বন্ধ হল ঠিক রাত বারোটায়।’

* * *

দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করতে হল।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেলাম। আকাশ কালো করে নিচে নেমে আসছে পঙ্গপালের মতো হাজার হাজার শকুনি। দেখে মনে হয় পৃথিবীতে যত শকুনি আছে সব একজোটে ওই ছ'হাজার ফুট লম্বা মানবদানবের শবদেহ ভক্ষণ করতে আসছে।

দৃশ্যটা দেখে ভালো লাগল না। অস্তত আমাদের চোখের সামনে এ-ঘটনা ঘটতে দেওয়া যায় না!

আমার আনাইহিলিন পিস্তলটা পকেট থেকে বার করে আকাশের দিকে তাক করে তিন সেকেণ্ড ঘোড়াটা টিপে রাখতেই দেখতে দেখতে শকুনির দল নিশ্চিহ্ন হয়ে বৃষ্টি-ধোয়া সাহারার আকাশের নীল নির্মল রূপটা আবার ফিরে এল।

কর্তস

৬৯

১৫ই আগস্ট

পাখি সম্পর্কে কৌতুহলটা আমার অনেক দিনের। ছেলেবেলায় আমাদের শব্দ পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করতে শিখিয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল পাখি কথা বললেও কথার মানে বোবে না। একবার এই ময়নাটাই এমন এক কাণ্ড করে বসল যে আমার সে ধারণা প্রায় পাণ্টে গেল। দুপুরবেলা সবে মাত্র আমি ইঙ্গুল থেকে ফিরছি, মা রেকাবিতে মোহনভোগ এনে দিয়েছেন, এমন সময় ময়নাটা হঠাৎ ‘ভূমিকম্প, ভূমিকম্প’ বলে চঁচিয়ে উঠল। আমরা কোনো কম্পন টের পাইনি, কিন্তু পরের দিন কাগজে বেরোল সিজ্মোগ্রাফ যন্ত্রে সত্যিই নাকি একটা মদু কম্পন ধরা পড়েছে।

সেই থেকে পাখিদের বুদ্ধির দৌড় সম্পর্কে মনে একটা অনুসন্ধিৎসা রয়ে গেছে, কিন্তু অন্যান্য পাঁচ রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে ওটা নিয়ে আর চৰ্চা করা হয়নি। আরেকটা কারণ অবিশ্য আমার বেড়াল নিউটন। নিউটন পাখি পছন্দ করে না, আর নিউটনকে অখুশি করে আমার কিছু করতে মন চায় না। সম্প্রতি, বয়সের জনোই বোধহয়, নিউটন দেখছি পাখি সম্বন্ধে অনেক উদাসীন হয়ে পড়েছে। সেই কারণেই আমার লাবরেটরিতে আবার কাক, চড়ুই, শালিক ঢুকতে আরম্ভ করেছে। আমি সকালে তাদের খেতে দিই। সেই খাদের প্রত্যাশায় তারা সূর্য ওঠার আগে থেকেই আমার জানালার বাইরে জটলা করে।

প্রত্যেক প্রাণীরই কিছু কিছু নির্দিষ্ট সহজাত ক্ষমতা থাকে। আমার ধারণা অন্য প্রাণীর তুলনায় পাখির ক্ষমতা আরো বেশি, আরো বিস্ময়কর। একটা বাবুইয়ের বাসা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। একজন মানুষকে কিছু খড়কুটো দিয়ে যদি ওরকম একটা বাসা তৈরি করতে বলা হয়, আমার বিশ্বাস সে

কাজটা সে আদো করতে পারবে না, কিংবা যদি বা পারে তো মাসখানেকের অক্লান্ত
পরিশ্রম লেগে যাবে।

অটোলিয়াতে ম্যালি-ফাউল বলে একবর্ষৰ কুমুদী আছে। অটোলিয়াতে ম্যালি-ফাউল বলে একটা চিপি, আর তার ডেতরে করে। বালি, মাটি আর উষ্ণিজ্জ দিয়ে তৈরি একটা চিপি, আর তার ডেতরে ঢেকার জন্য একটা গর্ত। ডিম পাড়ে বাসার ভিতরে, কিন্তু সে-ডিমে তা দেয় না। অথচ উত্তাপ না হলে তো ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোবে না। উপায় কী? উপায় হল এই যে ম্যালি-ফাউল কোনো এক আশ্চর্য অঙ্গাত কৌশলে বাসার ভিতরের তপগমাত্রা আটাওর ডিগ্রি ফারেনহাইটের এক ডিগ্রিও এন্দিক-ওদিক হতে দেয় না, তা বাইরের আবহাওয়া ঠাণ্ডা বা গরম যাই হোক না কেন।

আরো রহস্য। গীব নামক পাখি তাদের নিজেদের নামক হিচক হিচক বায় এবং শবকদের খাওয়ায়, কেন তা কেউ জানে না। আবার এই একই গীব পাখি জলে ভাসমান অবস্থায় কোনো শত্রুর আগমনের ইঙ্গিত পেলে নিজের দেহ ও পালক থেকে কোনো এক অজ্ঞাত উপায়ে বায়ু বার করে দিয়ে শ্রীরামের স্পেসিফিক গ্রাভিটি বাড়িয়ে গলা অবধি জলে ডুবে ভাসতে থাকে।

এ ছাড়া যায়াবর পাখির দিক্কনিণ্য ক্ষমতা, দগল-বাজের শক্তির ক্ষমতা, শকুনের ঘ্রাণশক্তি, অসংখ্য পাখির আশ্চর্য সংগীত-প্রতিভা—এসব ত্বো আছেই। এই কাবণ্ডেই কিছুদিন থেকে পাখির পিছনে কিছুটা চিঞ্চা ও সময় দিতে ইচ্ছা করছে ? তার সহজাত বুদ্ধির বাইরে তাকে কত দূর পর্যন্ত নতুন জিনিস শেখানো যায় ? মানুষের জ্ঞান, মানুষের বুদ্ধি তার মধ্যে সঞ্চার করা যায় কি ? এমন যন্ত্র কি তৈরি করা সম্ভব যার সহায়ে এ কাজটা হতে পারে ?

২০শে সেপ্টেম্বর

আমার পাখি পড়ানো যন্ত্র নিয়ে কাজ চলেছে। আম সহজ পথে বিশ্বাস।
আমার যন্ত্রও তাই হবে জনের মতো সহজ। দুটি অংশে হবে এই যন্ত্র। একটি
হবে খাঁচার মতো। পাখি থাকবে সেই খাঁচার মধ্যে। খাঁচার সঙ্গে বৈদ্যুতিক যোগ
থাকবে দ্বিতীয় অংশের। এই অংশটি থেকে জ্ঞান ও বুদ্ধি চালিত হবে পাখির
মস্তিষ্কে।

এই একমাস আগার ল্যাবরেটরির জানালা দিয়ে খাদ্যের লোভে যে সব পাখ
এসে ঢুকেছে সেগুলোকে আমি খুব মনোযোগ দিয়ে স্টাডি করেছি। কাক, চড়ুই,
শালিক ছাড়া পায়রা, ঘৃষ্ণ, টিয়া, বুলবুলি ইত্যাদিও মাঝে মাঝে আসে। সব পাখির
মধ্যে একটি বিশেষ পাখি বিশেষভাবে আগার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেটা একটা
কাক। দাঁড়িকাক নয়, সাধারণ কাক। কাকটা আগার চেনা হয়ে গেছে। ডান
চোখের নিচে একটা সাদা ফুটকি আছে, সেটা থেকে তো চেনা যায়ই, তাছাড়া

হাবভাবও অন্য কাকের চেয়ে বেশ একটু অন্য রকম। ঠোঁটে পেনসিল নিয়ে টেবিলের উপর আঁচড় কাটতে আর কোনো পাখিকে দেখিনি। কালকে তো একটা ব্যাপারে রীতিমত হচকিয়ে গেছি। আমি আমার যত্ন তৈরির কাজ করছি, এমন সময় একটা খচ খচ শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি কাকটা একটা আধ-খোলা দেশলাইয়ের বাক্স থেকে ঠোঁট দিয়ে একটা কাঠি বার করে তার মাথাটা বাস্ত্রের পাশটায় ঘষছে। আমি বাধা হয়ে হস হস শব্দ করে কাকটাকে নিরস্ত করলাম। কাকটা তখন উড়ে গিয়ে জানলায় বসে গলা দিয়ে দ্রুত কয়েকটা শব্দ করল যেটার সঙ্গে কাকের স্বাভাবিক কা-কা শব্দের কোনো সাদৃশ্য নেই। হঠাৎ শুনে মনে হবে যেন কাকটা বুঝি হাসছে।

যে রকম চালাক পাখি, আমার পরীক্ষার জন্য একে ব্যবহার করতে পারলেই
সবচেয়ে ভালো হবে। দেখা যাক কতদুর কী হয়।

২৭শে সেপ্টেম্বর

আমার ‘অরনিথন’ যন্ত্র আজ তৈরি শেষ হল। কাকটা সকালেই আমার ঘরে
চুকে পার্টুরটি খেয়ে এ জানালা ও জানালা লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল, যন্ত্রটা টেবিলের
উপর রেখে যেই তার দরজা খুলে দিলাম, অমনি কাক দিব্যি লাফাতে লাফাতে
এসে তার ভিতরে চুকে পড়ল। এ থেকে এটাই অনুমান করা যায় যে কাকটার
শেখার আগ্রহ প্রবল। প্রথমে কিছুটা ভাষা জ্ঞান হওয়া দরকার, নাহলে আমার
কথা বুঝতে পারবে না; তাই সহজ বাংলা দিয়ে শুরু করেছি। আমাকে বোতাম
টেপা ছাড়া আর কোনো কাজই করতে হচ্ছে না। শেখাবার বিষয় সমস্তই আগে
থেকে রেকর্ড করা। বিভিন্ন চ্যানেলে বিভিন্ন বিষয়, প্রত্যেকটার আলাদা নম্বর
দেওয়া। একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করলাম—বোতামটা টিপলেই কাকটার চোখ
ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার নড়াচড়াও বন্ধ হয়ে যায়।
কাকের মতো ছটফটে পাখির পক্ষে এটা যে কতো অস্বাভাবিক সে তো বুঝতেই
পারছি।

নভেম্বর মাসে চিলির রাজধানী সানতিয়াগো শহরে সারা বিশ্বের পক্ষিবিজ্ঞানীদের একটা কনফারেন্স আছে। মিনেসোটাতে আমার পক্ষিবিজ্ঞানী বন্ধু রিউফাস গ্রেনফেলকে একটা চিঠি লিখে দিয়েছি। যদি আমার বায়স বন্ধুটি সত্ত্ব করে মানুষের বুদ্ধি কিছুটা আয়ত্ত করতে পারে, তাহলে ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সংযোগে ডিমনস্ট্রেশন সহ একটা বজ্র্ণ দেওয়া চলতে পারে।

৪ষ্ঠা অংকোর

কর্ভাস হল কাক জাতীয় পাখির ল্যাটিন নাম। আমার ছাত্রত্বকে আমি ওই

নামেই ডাকছি। নাম ধরে ডাকলে প্রথম দিকে আমার দিকে ফিরে ফিরে চাইত, এখন দেখছি গলা দিয়ে শব্দ করে উত্তর দেয়। এই প্রথম একটা কাককে 'ক' না বলে 'কি' বলতে শুনছি। তবে কষ্টহরের বিশেষ পরিবর্তন আমি আশা করছি না। বলে 'কি' বলতে শুনছি। তার বুদ্ধির পরিচয় তার কাজেই অর্থাৎ কর্ভসকে দিয়ে কথা বলানোচ্ছবি না। তার বুদ্ধির পরিচয় তার কাজেই প্রকাশ পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

কর্ভস এখন ইংরিজি শিখছে। বাইরে গিয়ে ডিমন্সট্রেশন দিতে গেলে এই ভাষাটার প্রয়োজন হবে। ওর ট্রেনিংগের সময় হল সকাল আটটা থেকে নাটা। সন্ধ্যা দিনের বেলা বাকি সময়টা ও আমার ঘরের আশপাশেই ঘোরাফেরা করে। সন্ধ্যা হলে এখনো রোজই চলে যায় আমার বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণের আম গাছটায়।

নিউটন দেখছি কর্ভসকে দিব্য মেনে নিয়েছে। আজকে যে ঘটনাটা ঘটল তারপরে সম্পর্কটা বন্ধুত্বে পরিণত হলেও আশ্চর্য হব না। ব্যাপারটা ঘটল দুপুরে। নিউটন আমার আরাম কেদারাটোর পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে, কর্ভস কোথায় যেন উধাও, আমি খাতায় নোট লিখছি, এমন সময় হঠাৎ ডানার বাটগটানি শুনে জানালার দিকে ঢেয়ে দেখি কর্ভস ঘরে চুকেছে, তার ঠৈঁটে বাটগটানি শুনে জানালার দিকে ঢেয়ে দেখি কর্ভস ঘরে চুকেছে, তার ঠৈঁটে একটি সদ্য কাটা মাছের টুকরো। সে সেটাকে এনে থপ্প করে নিউটনের সামনে একটি সদ্য কাটা মাছের টুকরো। সে সেটাকে এনে থপ্প করে নিউটনের সামনে ফেলে দিয়ে আবার জানালায় ফিরে গিয়ে বসে ঘাড় বেঁকিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল।

গ্রেনফেল আমার চিঠির উত্তর দিয়েছে। লিখেছে সে পক্ষবিজ্ঞানীদের সম্মেলনে আমাকে নেমত্তন পাঠানোর বন্দোবস্ত করছে। আমি অবশ্যই মেন কাক সমেত যথাসময়ে সানতিয়াগোতে গিয়ে হাজির হই।

২০শে অক্টোবর

দুঃস্থাপ্তে অভাবনীয় প্রোগ্রেস। কর্ভস ঠৈঁটে পেনসিল নিয়ে ইংরিজি কথা আর সংখ্যা লিখছে। কাগজটাকে টেবিলের উপর ফেলে দিতে হয়, কর্ভস তার উপর দাঁড়িয়ে লেখে। ওর নিজের নাম ইংরিজিতে লিখল— C-O-R-V-U-S। সহজ যোগ বিয়োগ করতে পারছে, ইংল্যাণ্ডের রাজধানী কী জিগ্যেস করলে লিখতে পারছে, আমার পদবী লিখতে পারছে। তিনিদিন আগে মাস, বার, তারিখ শিখিয়ে দিয়েছিলাম, আজকে কী বার জিগ্যেস করাতে পরিষ্কার অক্ষরে লিখল—F-R-I-D-A-Y।

কর্ভসের খাওয়ার ব্যাপারেও বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছি। আজ একটা পাত্রে ঝটি টোস্টের টুকরো আর আরেকটাতে খানিকটা পেয়ারার জেলি ওর সামনে রেখেছিলাম। ও ঝটির টুকরোগুলো মুখে পোরার আগে প্রতিবারই ঠৈঁট দিয়ে

খানিকটা জেলি মাখিয়ে নিছিল।

২১শে অক্টোবর

কর্ভস যে এখন সাধারণ কাকের থেকে নিজেকে আলাদা রাখতে চায়, তার স্পষ্ট প্রমাণ আজকে পেলাম। আজ দুপুরে হঠাৎ খুব বৃষ্টি হল, সঙ্গে বিদ্যুৎ ও কাছে গিয়ে দেখি আমার বাগানের বাইরের শিমুল গাছটা থেকে ধৌঁয়া বেরোচ্ছে। বিকেলে বৃষ্টি থামার পর প্রচণ্ড কাকের কোলাহল। এ তল্লাটে যত কাক আছে, সব ওই মরা গাছটায় জড়ো হয়ে হল্লা করছে। আমার চাকর প্রহ্লাদকে ব্যাপারটা দেখতে পাঠালাম। সে ফিরে এসে বলল, 'বাবু, একটা কাক মরে পড়ে আছে গাছটার নিচে, তাই এত চেল্লাচেল্লি!' বুঝলাম বাজ পড়ার ফলেই কাকটার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য—কর্ভস আমার ঘর থেকে বেরোবার কোনোরকম আগ্রহ দেখাল না। সে একমনে পেনসিল মুখে দিয়ে প্রাইম নাম্বার্স লিখে চলেছে— 2,3,5,7,11,13....

৭ই নভেম্বর

কর্ভসকে এখন সদর্পে বৈজ্ঞানিক মহলে উপস্থিত করা চলে। পাখিকে শিখিয়ে পড়িয়ে খুটিনাটি ফরমাশ খাটানোর নানারকম উদাহরণ পাওয়া যায়, কিন্তু কর্ভসের মতো এমন শিক্ষিত পাখির নজির পথিবীর ইতিহাসে তার আছে বলে আমার জানা নেই। অরনিথন যদ্বের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। অঙ্ক, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদি সব বিষয়ই যে-সব প্রশ্নের উত্তর সংখ্যার সাহায্যে বা অল্প কয়েকটি শব্দের সাহায্যে দেওয়া যায়, কর্ভস তা শিখে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মধ্যে যে জিনিসটা প্রায় আপনা থেকে জেগে উঠেছে, সেটাকে বলা চলে মানবসুলভ বুদ্ধি বা হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স—য়েটার সঙ্গে পাখির কোনো সম্পর্ক নেই। উদাহরণ স্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। সানতিয়াগো যাব বলে আজ সকালে আমার সুটকেস গোছাছিলাম। গোছানো শেষ হলে পর বাস্তুর ঢাকনা বক্ষ করে পাশে ফিরে দেখি কর্ভস সুটকেসের ঢাবিটা ঠৈঁটে নিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে।

কাল গ্রেনফেলের আরেকটা চিঠি পেয়েছি। ও সানতিয়াগো পৌঁছে গেছে। পক্ষবিজ্ঞানী সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ আমার আসার পথ চেয়ে আছে। এত আগে এই সব সম্মেলনে কেবল পাখি নিয়ে বক্তৃতাই হয়েছে, জ্যাত পাখির সাহায্যে উদাহরণ সমেত কোনো বক্তৃতা কখনো হয়নি। গত দু'মাসের গবেষণার ফলে পাখির মস্তিষ্কের বিষয় আমি যে দুর্লভ জ্ঞান সংগ্রহ করেছি, সে সম্পর্কে একটা

প্ৰবন্ধ লিখছি। সেটাই সম্মেলনে হবে আমাৰ পেপাৰ। প্ৰতিবাদীৰ মুখ বন্ধ কৰাৱ
জন্য সঙ্গে থাকবে কৰ্ত্তসি।

১০ই নভেম্বৰ

দক্ষিণ আমেরিকা যাবাৰ পথে প্ৰেনে বসে এই ডায়াৰি লিখছি। একটি মাত্ৰ
ঘটনাই লেখাৰ আছে। বাড়ি থেকে যথন রওনা হব, তখন কৰ্ত্তসি হঠাৎ দেখি
তাৰ খাঁচা থেকে বাৰ হবাৰ জন্য ভাৰি ছট্টফট আৱস্থা কৰেছে। কী ব্যাপাৰ বুৰাতে
না পেৱে খাঁচাৰ দৱজা খুলে দিতেই সে স্টোন উড়ে গিয়ে আমাৰ রাইটিং টেবিলে
বসে ঠোঁট দিয়ে উপৰেৰ দেৱাজটায় ভীষণ ব্যন্তভাৱে টোকা মাৰতে আৱস্থা
কৰল। দেৱাজ খুলে দেখি আমাৰ পাসপোর্ট-টা তাৰ মধ্যে রয়ে গেছে।

কৰ্ত্তসিৰ জন্য একটা নতুন ধৰনৰে খাঁচা বানিয়ে নিয়েছি। যে আবহাওয়া
কৰ্ত্তসিৰ পক্ষে সবচেয়ে আৱামদায়ক, খাঁচাৰ ভিতৰ কৃত্ৰিম উপায়ে সেই
আবহাওয়া বজায় রাখাৰ ব্যবস্থা কৰেছি। খাবাৰ জন্য কাকেৰ পক্ষে পুষ্টিকৰ
ভিটামিন দিয়ে হোমিওপ্যাথিক বড়িৰ মতো মুখৰোচক বড়ি তৈৰি কৰে নিয়েছি।

প্ৰেনেৰ যাত্ৰাদেৱ মধ্যে কেউই ৰোধহয় এৱ আগে কখনো পোৱা কাক
দেখেন। কৰ্ত্তসি তাই সকলেৰই কৌতুহল উদ্বেক কৰেছে। তবে আমি আমাৰ
কাকেৰ বিশেষজ্ঞ সম্পর্কে কাউকে কিছু বলিনি। ব্যাপাৰটা গোপন রাখতে চাই
অনুমান কৰেই ৰোধহয় কৰ্ত্তসিৰ সাধাৰণ কাকেৰ মতোই ব্যবহাৰ কৰেছে।

১৪ই নভেম্বৰ

হোটেল একসেলসিয়াৰ, সানতিয়াগো। রাত এগাৰোটা। দু'দিন খুব ব্যন্ত
ছিলাম তাই ডায়াৰি লেখাৰ সময় পাইনি। আগে আমাৰ বক্তৃতাৰ কথাটা বলে
নিই, তাৰপৰ এই কিছুক্ষণ আগেৰ চাপ্পল্যকৰ ঘটনায় আসা যাবে। এক কথায়
নিই, তাৰপৰ এই কিছুক্ষণ আগেৰ বক্তৃতাটা হয়েছে—অ্যানাদাৰ ফেদোৱ ইন মাই
বলা যায়, কৰ্ত্তসি-সহ আমাৰ বক্তৃতাটা হয়েছে। অ্যানাদাৰ ফেদোৱ ইন মাই
ক্যাপ। লেখাটা পড়তে লেগেছিল আধ ঘণ্টা, তাৰপৰ কৰ্ত্তসিৰে খাঁচা থেকে
ডিমন্সট্ৰেশন চলল এক ঘটাৰ উপৰ। আমি মধ্যে উঠেই কৰ্ত্তসিৰে খাঁচা থেকে
তাৰ পিছনে লাইন কৰে সম্মেলনেৰ কৰ্তৃপক্ষৰা বসেছেন, আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে
মাইক্ৰোফোনে আমাৰ প্ৰবন্ধ পড়ছি। পড়া যতক্ষণ চলল ততক্ষণ কৰ্ত্তসি এক পাও
নড়েনি। তাৰ এক পাশে ঘাড় কাত কৰাৰ ভঙ্গি ও মাঝে মাঝে মাথাৰ উপৰ নিচ
কৰা থেকে মনে হচ্ছিল সে গভীৰ মনোযোগ দিয়ে আমাৰ কথা শুনছে এবং কথা
বুৰাতেও পাৰছে। বক্তৃতা শেষ হবাৰ পৰ চাৰিদিক থেকে কৰধৰনিৰ সঙ্গে সঙ্গে
একটা কাঠঠোকৰার মতো শব্দ শুনে টেবিলেৰ দিকে চেয়ে দেখি কৰ্ত্তসি তাৰ ঠোঁট

কৰ্ত্তসি

দিয়ে হাততালিৰ সঙ্গে তাল মিলিয়ে টেবিলেৰ উপৰ ঠুকে চলেছে।

ডিমন্সট্ৰেশনেৰ সময় অবিশ্বিক কৰ্ত্তসিৰ কোনো বিৱাহ ছিল না। গত দু'মাসে
সে যা কিছু শিখেছে সবই সম্মেলনেৰ অভ্যাগতদেৱ সামনে উপস্থিত কৰে তাঁদেৱ
তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সকলেই একবাক্যে স্বীকাৰ কৰেছে যে পাখিৰ মস্তিকে
মানুষেৰ জ্ঞান ও বুদ্ধি যে এভাৱে প্ৰৱেশ কৰতে পাৱে তা কেউ কল্পনাই কৰতে
পাৱেনি। এখানকাৰ কাগজ কোৱিয়েৰে দেল সানতিয়াগোৰ সাঙ্ক সংস্কৰণে এৱ
মধ্যেই কৰ্ত্তসিৰ খবৰ বেৱিয়ে গেছে। শুধু বেৱিয়েছে নয়, প্ৰথম পাতাৰ প্ৰধান
খবৰ হিসেবে বেৱিয়েছে, আৱ তাৰ সঙ্গে বেৱিয়েছে পেনসিল মুখে কৰ্ত্তসিৰ
একটা ছবি।

মিটিং-এৱ পৰ গ্ৰেনফেল ও সম্মেলনেৰ চেয়াৰম্যান সিনিয়াৰ কোভাৰবিয়াসেৰ
সঙ্গে সানতিয়াগো শহৰ দেখতে বেৱিয়েছিলাম। জনবহুল মনোৱাম আধুনিক
শহৰ, পুবদিকে আঙ্গীকৰ্ত্তৃত শ্ৰেণী চিলি ও আৱজেনচিনাৰ মধ্যে প্ৰাচীৱেৰ মতো
দাঁড়িয়ে আছে। ঘণ্টাখালেক ঘোৱাৰ পৰ কোভাৰবিয়াস বললেন, ‘সম্মেলনেৰ
প্ৰোগ্ৰামে দেখে থাকবে অতিথিদেৱ জন্য আমোৰ নানা রকম আমোদপ্ৰমোদেৱ
আয়োজন কৰেছি। তাৰ মধ্যে আজ বিকেলেৰ ব্যাপাৰটায় আমি ব্যক্তিগতভাৱে
তোমাকে উপস্থিত থাকতে অনুৰোধ কৰছি। একটি চিলিয়ান জাদুকৰ আজ
তামাশা দেখাবেন তোমাদেৱ খাতিৱে। ইনি আগৰ্স নামে পৰিচিত। এৱ বিশেষজ্ঞ
হচ্ছে এই যে, ইনি ম্যাজিকে নানাকৰম পাখি ব্যবহাৰ কৰেন।’

ব্যাপাৰটা শুনে কৌতুহল হয়েছিল, তাই আমি আৱ গ্ৰেনফেল আজ বিকেলে
এখানকাৰ প্ৰাজা থিয়েটাৱে আগৰ্সেৰ ম্যাজিক দেখতে গিয়েছিলাম। লোকটা
নানাকৰম পাখি ব্যবহাৰ কৰে সেটা ঠিকই। হাঁস, কাকাতুয়া, পায়াৱা, মোৱগ,
একটা তিন হাত লম্বা সারস, এক বাঁক হামিং বাৰ্ড—এ সবই কাজে লাগায়
আগৰ্স এবং বোঝাই যায় যে সব ক'টি পাখিকেই সে বেশ দক্ষতাৰ সঙ্গে কাজ
শিখিয়ে নিয়েছে। বলাবাঞ্ছল্য, এই কাজেৰ কোনোটাই আমাৰ কৰ্ত্তসিৰ কৃতিহৰে
ধাৰে কাছেও আসে না। সত্যি বলতে কী পাখিৰ চেয়ে আমাৰ অনেক বেশি
ইন্টাৱেস্টিং মনে হ'ল জাদুকৰ ব্যক্তিকে। টিয়া পাখিৰ মতো নাক, মাৰখানে
সিথি কৱা টান কৰে পিছনে আঁচড়ানো নতুন গ্ৰামোফোন রেকৱডেৱ মতো
চকচকে চুল, চোখে মাইনাস পাওয়াৱেৰ চশমা, তাৰ কাঁচ এত পুৰু যে মণি
দুটোকে তীক্ষ্ণ বিন্দুৰ মতো দেখায়। লম্বায় লোকটা ছ' ফুটেৱ উপৰ। চকচকে
কালো কোটেৱ আস্তিনেৰ ভিতৰ থেকে দুটো শীৰ্ণ ফ্যাকাসে হাত বেৱিয়ে আছে,
সেই হাতেৰ বিভিন্ন ভঙ্গিমাই দৰ্শকদেৱ সম্মোহিত কৰে রাখে। জাদু খুব উঁচুদৱেৱ
না হলেও, জাদুকৱেৰ চেহাৱা ও হাবভাৱ দেখেই প্ৰায় পয়সা উঠে আসে। আমি
শো দেখে হল থেকে বেৱোৱাৰ সময় গ্ৰেনফেলকে পৰিহসচ্ছলে বললাম,

‘আমাদের যেমন আগসের ম্যাজিক দেখানো হল, আগসকে তেমনি কর্তসের খেলা দেখাতে পারলে মন্দ হত না।’

ଖେଳା ଦେଖାତେ ଗାରିମା ଦିଲାମ ।
ରାତ ନଟୀଯ ଡିନାର ଓ ତାରପରେ ଅତି ଉପାଦେୟ ଚିଲିଆନ କାଫ ଖେଯେ
ଗ୍ରେନଫେଲେର ସଙ୍ଗେ ହୋଟେଲେର ବାଗାନେ କିଛୁକଣ କାଟିଯେ ସବେମାତ୍ର ଘରେ ଏସେ ବାତି
ନିଭିଯେ ବିଛାନାଯ ଶୁଣେଛି, ଏମନ ସମୟ ଟେଲିଫୋନ ବେଜେ ଉଠିଲ । ଆମି ଏକଟୁ
ଅବାକ ହୁୟେ ଅନ୍ଧକାରେଇ ରିସିଭାରଟା ତୁଲେ କାନେ ଦିଲାମ ।

‘সিনিয়র শক্তি ?

‘হাঁ—’
‘আমি রিসেপশন থেকে বলছি। আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা চাইছি। একটি ভদ্রলোক বিশেষ করে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।’

আমি বাধ্য হয়েই বললাম যে আমি ক্লাস্ট, সুতরাং ভদ্রলোক যাদ কাল সকালে
আমাকে টেলিফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারেন তাহলে ভালো
হয়। নিচয়ই কোনো রিপোর্ট র হবে। এর মধ্যেই চারজন সাংবাদিককে
ইন্টারভিউ দিতে হয়েছে এবং তারা যে সব প্রশ্ন করেছে তাতে আমার মতো ঠাণ্ডা
মেজাজের মানুষকেও রীতিমত অসহিষ্ণু হয়ে পড়তে হয়। একজন সরাসরি
জিগ্যেস করলেন ভারতবর্ষে যেমন গৱর্নকে পুজো করা হয়, তেমনি কাককেও হয়
কিন।

ରିସେପ୍ଶନ ଲୋକଟିର ସଙ୍ଗେ କଥା ବଲେ ବଲଳ, 'ସାନ୍ତ୍ୟର ଶକ୍ତି, ଭଦ୍ରଲୋକ ବଲଛେ' ତିନି ପାଂଚ ମିନିଟ୍ରେ ବେଶି ସମୟ ନେବେନ ନା । ସକାଳେ ଓର ଏକଟା ଅନ୍ୟ ଏନ୍ଦଗେଜମେନ୍ଟ୍ ରଯେଛେ ।

ବଲାମ୍. 'ଯିନି ଏମେହେ ତିନି କି ସଂବାଦପତ୍ରେର ଲୋକ ?'

‘আজ্জে, না। ইনি হলেন বিখ্যাত চিলিয়ান জাদুকর আগাস।’
নামটা শুনে বাধ্য হয়েই ভদ্রলোককে উপরে আসতে বলতে হল। বিছানার
পাশের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিলাম। তিনি মিনিট পরে কলিং বেল বেজে
উঠল।

দুরজা খুলে যাকে সামনে দেখলাম তাকে স্টেজে ছ' ফুট বলে মনে হয়েছিল, এখন বুবালাম তিনি সাড়ে ছ' ফুটেরও বেশি লম্বা। সত্যি বলতে কী, এত লম্বা মানুষ এর আগে আমি কখনো দেখিনি। বিলিতি কায়দায় সামনের দিকে ঝুকে পড়ে নমস্কার জানাবার সময়ও তিনি আমার চেয়ে প্রায় ছ' ইপিং লম্বা রয়ে গেলেন। ভদ্রলোককে ঘরে আসতে বললাম। স্টেজের পোশাক ছেড়ে জাদুকর এখন সাধারণ সুট পরে এসেছেন, তবে এ সুটের বঙ্গও কালো। ঘরে ঢোকার পর লক্ষ করলাম কোটের পকেটে কোরিয়েরে দেল সানতিয়াগোর সান্ধা সংক্রণ। আর্গাস চেয়ারে বসার পর তার ম্যাজিকের তারিফ করে বললাম, ‘যতদূর মনে

পড়ছে, গ্রীক উপকথায় আগর্সি নামক একজন কীর্তিমান পুরুষের কথা পড়েছিল যার সর্বাঙ্গে ছিল সহস্র চোখ। একজন জাদুকরের পাস্তু নামটি হচ্ছে—

আগৰ্স মন্দু হেসে বললেন, ‘সেই কীর্তিমান পুরুষটির সঙ্গে পাথিৰ একটা সম্পর্ক রয়েছে মনে পড়ছে নিশ্চয়তা।’

আমি বললাগ, ‘হ্যাঁ। শীক দেবী হেরা আগামিসের চোখগুলি তুলে ময়ুরের পুচ্ছে
বসিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই ময়ুরের লেজে চাকা চাকা দাগ। কিন্তু আমার
কোতুহল হচ্ছে আপনার চোখ সম্পর্কে। কৃত পাওয়ার আপনার চোখার—’

‘মাইনাস কুড়ি। তবে তাতে কিছু এসে যায় না। আমার পাখিগুলোর কোনোটারই চশমার প্রয়োজন হয় না।’

নিজের রসিকতায় নিজেই অটুহাস্য করে উঠলেন আগামি। কিন্তু সে হাসি ফুরোবার আগেই ভদ্রলোক হঠাৎ মুখ হাঁ অবস্থাতেই থেকে গেলেন। তাঁর চোখ চলে গেছে আমার ঘরের তাকে রাখা প্লাস্টিকের খাঁচাটির দিকে। কর্তস্য ঘূর্মিয়ে পড়েছিল; এখন দেখছি জাদুকরের অটুহাসিতেই বোধহয় তার ঘূর্মাটা ভেঙে গেছে। সে দিবি ড্যাব ড্যাব করে ঢেয়ে আছে আগন্ধুকটির দিকে।

আগাম মুখ হাঁ অবস্থাতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে খাঁচাটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর মিনিটখানেক ধরে কর্ভাসের দিকে চেয়ে বললেন, ‘আজ সন্ধ্যার কাগজে এর বিষয় পড়ে অবধি আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্ঘোষ হয়ে আছি। আপনার বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি পক্ষিবিজ্ঞানী নই, কিন্তু আমিও পাখিদের শিক্ষা দিয়ে থাকি।’

ଭଦ୍ରଲୋକ ଚିତ୍ତିତଭାବେ ଫିରେ ଏମେ ଚୟାରେ ବସଲେନ । ତାରପର ବଳଲେନ, ‘ବେଶ ବୁଝାତେ ପାରଛି ଆପଣି ଝାଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ତାଓ ଅନୁରୋଧ କରଛି—ଯଦି ଆପଣାର ଏହି ପାଖିଟିକେ ଏକବାର ଖୀଚା ଥେକେ ବାର କରତେ ପାରେନ...ଏକବାର ଯଦି ଓର ବୁନ୍ଦିର ଏକଟୁ ନମନା...’

আমি বললাম, ‘শুধু আমিই ক্লাস্ট নই, আমার পাখিও ক্লাস্ট। আমার যৌঁচার দরজা খুলে দিছি। বাকিটা নির্ভর করবে আমার পাখির মেজাজের উপর। আমি ওকে জোর করে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করাতে চাই না।’

‘বেশ তো—তাঁটি থেক...’

খাঁচার দরজা খুলে দিলাম। কর্ভসি বেরিয়ে এসে ডানার তিন ঝাপটায় আমার খাটের পাশে টেবিলটায় এসে এক অবার্থ ঠেকরে লাঞ্চ নিভিয়ে দিল।

ঘর এখন অঙ্ককার। জানালা দিয়ে রাস্তার উল্টোদিকে হোটেল মেট্রোপোলের জুলা-নেতৃ সবুজ নিয়ন্ত্রণের ফিকে আলো ঘরে প্রবেশ করছে। আমি চৃপ। কর্ভাস ডানা বাটপটিয়ে ফিরে গিয়ে খাঁচায় ঢুকে ঠৌঁট দিয়ে টেনে দরজা বন্ধ করে দিল।

আগামীর মুখের উপর সবুজ আলো নিয়ন্ত্রণের তালে তালে ঝলছে, নিভছে।

তার সোনার চশমার পুরু কাচের ভিতর সাপের মতো চোখ সবুজ আলোয় আরো
বেশি সাপের মতো মনে হচ্ছে। বেশ বুবাতে পারছি সে অবাক, হতভদ্র। বেশ
বুবাতে পারছি কর্ভস ঘরের বাতি নিভিয়ে তার মনের যে ভাবটা প্রকাশ করল
সেটা আগসের বুবাতে বাকি নেই। কর্ভস এখন বিশ্রাম চাইছে। সে চায় না ঘরে
আলো ছালে। সে অঙ্ককার চায়, অঙ্ককারে ঘুমোতে চায়।

আর আগস ? তার সরু গৌঁফের নিচে টৌটের ফাঁক দিয়ে একটা ফিসফিসে
শুধু উচ্চারিত হল—‘ম্যানিফিকো !’—অর্থাৎ চমক্প্রদ, অসামান্য। সে তার হাত
দুটো যেন তালির ভদ্রিতে ধূতনির সামনে এনে জড়ো করেছে। লক্ষ করলাম
তার নখগুলো অস্থাভাবিক রকম লম্বা ও চকচকে। বুবালাম সে নথে নেল পালিশ
মেখেছে। রূপোলি পালিশ। তার ফলে মধ্যের স্পট লাইটে আঙুলের খেলা জমে
ভালো। সেই রূপোলি নথে এখন বার বার বাইরের সবুজ নিয়ন্ত্রে আলো
প্রতিফলিত হচ্ছে।

‘আই ওয়ান্ট দ্যাট ক্রো !’

ফিসফিসে শুকনো গলায় ইংরিজিতে আগসের কথা এল। এতক্ষণ সে
স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলছিল আমার সঙ্গে। কথাগুলো লিখতে গিয়ে বুবাতে
পারছি তাতে একটা নগ্ন নির্ভজ লোভের ইঙ্গিত এসে পড়ছে, কিন্তু আসলে
আগসের কঠস্বরে ছিল অনুনয়।

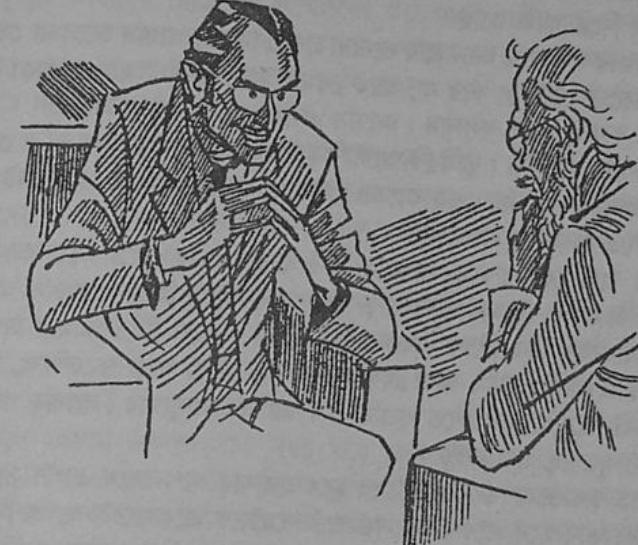
‘আই ওয়ান্ট দ্যাট ক্রো !’—আবার বলল আগস।

আমি চুপ করে তার দিকে চেয়ে রইলাম। এখন কিছু বলার দরকার নেই।
আরো কী বলতে চায় লোকটা দেখা যাক।

আগস এতক্ষণ জানালার দিকে চেয়ে ছিল। এবার সে আমার দিকে দৃষ্টি
ফেরাল। তারি অঙ্গুত লাগছিল এই অঙ্ককার আর সবুজ আলোর খেলা। এও
যেন একটা ভেলকি। লোকটা এই আছে, এই নেই।

আগসের লম্বা আঙুলগুলো নড়েচড়ে উঠল। সেগুলো এখন তার নিজের
দিকে ইঙ্গিত করছে।

‘আমাকে দেখ প্রোফেসর। আমি আগস। আমি বিশ্বের সেরা জাদুকর। দুই
আমেরিকার প্রতিটি শহরের প্রতিটি জাদুপ্রিয়লোক আমাকে চেনে। ছেলে, বুড়ো,
মেয়ে, পুরুষ সবাই চেনে। আগামী মাসে আমি প্রথিবী দ্রুণে বেরোচ্ছি। রোম,
ম্যাড্রিড, প্যারিস, লন্ডন, অ্যাথেন্স, স্টকহোল্ম, টোকিও, হংকং...। আমার
ক্ষমতা এবার স্বীকৃত হবে সারা বিশ্বে। কিন্তু আমার চমকপ্রদ ম্যাজিক আরো
সহস্র গুণে বেশি চমকপ্রদ হবে—কীসে জান ? ইফ আই গেট দ্যাট ক্রো—দ্যাট
ইন্ডিয়ান ক্রো ! ওই পাখি আমার চাই প্রোফেসর—ওই পাখি আমার
চাই...আমার চাই...আমার চাই...’



আগস তার ফিসফিসে কথার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতটা আমার চোখের সামনে
নাড়ছে, আঙুলগুলোকে সাপের ফণার মতো দোলাচ্ছে, নখগুলো সবুজ আলোয়
চকচক করছে। আমি মনে মনে হাসলাম। আমার জায়গায় অন্য যে কোনো
লোক হলে আগসের কাষিসিকি হত। অর্থাৎ সে লোক হিপনোটাইজড হত, সেই
সুযোগে খাঁচার পাখিও আগসের হস্তগত হত। আমাকে হিপনোটাইজ করা যে
সহজ নয় সেটা আমার কথা থেকেই বোধহয় জাদুকর বুবাতে পারলো।

‘মিস্টার আগস, আপনি বৃথা বাক্য ব্যয় করছেন। আর আমাকে সম্মোহিত
করার চেষ্টাও বৃথা। আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কর্ভস
শুধু আমার ছাত্রই নয়, সে আমার সন্তানের মতো, সে আমার বন্ধু, আমার অক্লান্ত
পরিশ্রম ও গবেষণার—’

‘প্রোফেসর !’—আগসের কঠস্বর আগের চেয়ে অনেক তীব্র। কিন্তু
পরক্ষণেই সে আবার গলা নামিয়ে বলে চলল, ‘প্রোফেসর, তুমি কি জান যে আমি
ক্রোডপতি ? শহরের পূর্ব প্রান্তে আমার একটা পঞ্চাশ কামরাবিশিষ্ট প্রাসাদ রয়েছে
সেটা কি তুমি জান ? আমার বাড়িতে ছাবিশজন চাকর, আমার চারটে
ক্যাডিলাক গাড়ি—এ সব কি তুমি জান ? খরচের তোয়াকা আমি করি না,

প্রোফেসর। ওই পাখির জন্য তোমাকে আমি আজই, এক্সুনি, দশ হাজার এস্কুড়ো দিতে রাজি আছি।'

দশ হাজার এস্কুড়ো মানে প্রায় পনেরো হাজার টাকা। আগার্স জানে না যে সে যেমন খরচের তোয়াক্কা করে না, আমি তেমনি টাকা জিনিসটারই তোয়াক্কা করি না। সে কথাটা তাকে বললাম। আগার্স এবার একটা শেষ চেষ্টা করল।

'তুমি তো ভারতীয়। তুমি কি অলোকিক যোগাযোগে বিশ্বাস কর না? ভেবে দেখ—আগার্স—কর্ভস! ওই কাকের নামকরণ হয়েছে আমারই জন্য সেটা কি তুমি বুঝতে পারছ না, প্রোফেসর?'

আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বললাম, 'মিস্টার আগার্স—তোমার গাড়ি বাড়ি খাতি অর্থ নিয়ে তুমি থাক, কর্ভস আমার কাছেই থাকবে। ওর শিক্ষা এখনো শেষ হয়নি। ওকে নিয়ে আমার এখনো অনেক কাজ থাকি। আমি আজ ক্লাস্ট। তুমি পাঁচ মিনিট সময় চেয়েছিলে, আমি ঘুমে মিনিট দিয়েছি, আর দিতে পারছি না। আমি এখন ঘুমোব। আমার পাখিও ঘুমোবে। সুতরাং, গুড নাইট।'

আমার কথাগুলো শুনে আগার্সের মুখে হতাশার ছাপ দেখে একটা সামান্য অনুকম্পার ভাব মনে প্রবেশ করলেও আমি সেটাকে একেবারেই আমল দিলাম না। আগার্স আবার বিলিতি কায়দায় মাথা নুইয়ে স্প্যানিশ ভাষায় গুড নাইট জানিয়ে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে খাঁচার কাছে গিয়ে দেখি কর্ভস এখনো জেগে আছে। আমি যেতেই সে ঠোঁট ফাঁক করে একটা শব্দ উচ্চারণ করল 'কে' এবং শব্দটাতে যে একটা জিজ্ঞাসা রয়েছে সেটা তার বলার সুরেই স্পষ্ট।

বললাম, 'এক পাগলা জাদুকর। টকার গরমটা বড় বেশি। তোমাকে চাইতে এসেছিল, আমি না করে দিয়েছি। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পার।'

১৬ই নভেম্বর

ভেবেছিলাম কালকের ঘটনা, কালকেই লিখে রাখব, কিন্তু বিভীষিকার ঘোর কাটতে সারা রাত লেগে গেল।

কাল সকালটা যেভাবে শুরু হয়েছিল, তাতে বিপদের কোনো পূর্বভাস ছিল না। সকালে সম্মেলনের বৈঠক ছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে জাপানী পক্ষবিজ্ঞানী তোমাসাকা মোরিমোতোর ঘোর ক্লাস্টিকর ভাষণ। সঙ্গে কর্ভসকে নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতার পর হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেলে মোরিমোতো আমতা আমতা করছিল, এমন সময় কর্ভস হঠাৎ আমার চেয়ারের হাতলে সশব্দে ঠোঁটতালি আরম্ভ করে দিল। হলের লোক তাতে হো হো করে

হেসে ওঠাতে আমি ভাবী অপ্রস্তুতে পড়ে গিয়েছিলাম।

দুপুরে আমাদের হোটেলেই সম্মেলনের কয়েকজন ডেলিগেটের সঙ্গে লাঞ্চ ছিল। সেখানে যাবার আগে আমি আমার একান্তর নম্বর ঘরে এসে কর্ভসকে খাঁচায় রেখে খাবার দিয়ে বললাম, 'তুমি থাক। আমি খেয়ে আসছি।' বাধ্য কর্ভস কোনো আপন্তি করল না।

লাঞ্চ শেষ করে যখন ওপরে এসেছি তখন আড়াইটে। দরজায় চাবি লাগাতেই বুল্লাম সেটার প্রয়োজন হবে না, কারণ দরজা খেলা। মুহূর্তের মধ্যে একটা চরম বিপদের আশঙ্কা আমার রক্ত জল করে দিল। বড়ের মতো ঘরে চুকে দেখি—যা ভেবেছিলাম তাই। খাঁচা সমেত কর্ভস উধাও।

আবার বড়ের মতো ঘরের বাইরে এলাম। উন্নরদিকে দুটো ঘর পরেই বাঁদিকে রুম-বয়দের ঘর। উর্ধবশাস্ত্রে সে ঘরে দেখি দুটো রুম-বয়ই পাশাপাশি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখের চাহনি দেখতেই বুঝতে পারলাম তাদের দুজনকেই হিপনোটাইজ করা হয়েছে।

চলে গেলাম একশো সাত নম্বর ঘরে গ্রেনফেলের কাছে। তাকে সমস্ত ব্যাপারটা বলে দুজন স্টান গিয়ে হাজির হলাম একতলার রিসেপশনে। রিসেপশন ক্লার্ক বলল, 'আমাদের কাছ থেকে কেউ আপনার ঘরের চাবি চাইতে আসেনি। ডুপলিকেট চাবি রুম-বয়দের কাছে থাকে, তারা যদি দিয়ে থাকে।'

রুম-বয়দের অবিশ্বাস দেওয়ার দরকার হয়নি। আগার্স তাদের জানুবলে তাকেজো করে দিয়ে নিজেই চাবি নিয়ে তার কাজ হাসিল করেছে।

শেষটায় হোটেলের দ্বাররক্ষকের কাছে গিয়ে আসল খবর পাওয়া গেল। সে বলল, আধ ঘন্টা আগে একটা সিলভার ক্যাডিলাক গাড়িতে আগার্স এসেছিলেন। তার দশ মিনিট পরে হাতে একটা সেলোফেনের ব্যাগ নিয়ে তিনি হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে চলে যান।

রুপোলি রঙের ক্যাডিলাক। কিন্তু এখান থেকে কোথায় গেছে আগার্স? তার বাড়িতে কি? না অন্য কোথাও?

অবশ্যে কোভারবিয়াসের শরণাপন হতে হল। ভদ্রলোক বললেন, 'আগার্সের বাড়ি কোথায় সেটা এক্সুনি জেনে দিতে পারি, কিন্তু তাতে কি লাভ হবে? সে কি আর বাড়িতে গেছে? সে তোমার কর্ভসকে নিয়ে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। তবে সে যদি শহরের বাইরে বেরোতে যায় তাহলে একটাই রাস্তা আছে। তোমাদের আমি ভালো গাড়ি, ভালো ড্রাইভার আর সঙ্গে পুলিশ দিতে পারি। সময় কিন্তু খুব কম। আধ ঘন্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়। হাইওয়ে ধরে চলে যাবে। যদি কপালে থাকে তো তার সন্ধান পাবে।'

সোয়া তিনটের মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। রওনা হবার আগে হোটেল

থেকে ফোন করে জেনে নিয়েছিলাম যে আগাস (আসল নাম দেমিনগো বার্তোলেমে সারমিয়েন্টো) তার বাড়িতে ফেরেনি। আমাদের সঙ্গে দুজন সশস্ত্র পুলিশ, আমরা পুলিশের গাড়িতেই চলেছি। দুজন পুলিশের একজন—চোকরা বয়স, নাম কারেৱাস—দেখলাম আগাস সমষ্টে বেশ খবর-টবর রাখে। বলল, সানতিয়াগো এবং আশেপাশে আগাসের নাকি একাধিক আস্তানা আছে। এককালে জিপসিদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছে। উনিশ বছর বয়স থেকে এককালে জিপসিদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছে। পাখি নিয়ে ম্যাজিক শুরু করেছে বছর চারেক ম্যাজিক দেখাতে আরও করেছে। আগে, আর সেই থেকেই ওর জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করেছে।

আমি জিগ্যেস কৰলাম, ‘ও কি সত্যিই ক্রোডপতি?’

কারেৱাস বলল, ‘তাই তো মনে হয়। তবে লোকটা ভয়ানক কঙ্গুস, আর কাউকে বিশ্বাস করে না। তাই ওর বন্ধু বলতে এখন আর বিশেষ কেউ নেই।’

শহর থেকে বেরিয়ে হাইওয়েতে পড়ে একটা মুশকিল হল। হাইওয়ে দুভাগে ভাগ হয়ে একটা চলে গেছে উত্তরে লস আনডিজের দিকে, আরেকটা চলে গেছে পশ্চিমে ভালপারাইজো বন্দর পর্যন্ত। দুটো হাইওয়ের মুখের কাছে একটা পেট্রোলের দোকান। দোকানের লোকটাকে জিগ্যেস করাতেই সে বলল, ‘ক্যাডিলাক? সিনিয়র আগাসের ক্যাডিলাক? সে তো গেছে ভালপারাইজোর রাস্তায়।’

আমাদের কালো মারসেডিস তীব্রবেগে রওনা দিল ভালপারাইজোর উদ্দেশে। কৰ্ত্তসের প্রাণহানি হবে না সেটা জানি, কারণ তার প্রতি আগাসের লোভটা খাঁটি। কিন্তু কাল রাত্রে কৰ্ত্তসের হাবভাব দেখেই বুঝেছিলাম যে সে জাদুকর লোকটিকে মোটেই পছন্দ করছে না। সুতৰাং আগাসের খপ্পরে পড়ে তার যে মনের অবস্থা কী হবে সেটা ভাবতেই খারাপ লাগছে।

পথে আরো দুটো পেট্রোল স্টেশন পড়ল, এবং দুটোরই মালিকের সঙ্গে কথা বলে আমরা নিশ্চিত হলাম যে আগাসের সিলভার ক্যাডিলাক এই রাস্তা দিয়েই গেছে।

আমি আশাবাদী লোক নানান সময় নানান সংকট থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এসেছি। আজ পর্যন্ত আমার কোনো অভিযানই ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু আমার পাশে বসে গ্রেনফেল ঘন ঘন মাথা নাড়েছে আর বলছে, ‘ভুলে যেও না শঙ্খ—তুমি একজন অত্যন্ত ধূর্ত লোকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছ। তোমার কৰ্ত্তসকে সে যখন একবার হাতে পেয়েছে, তখন সে পাখি তুমি সহজে ফিরে পাবে না এটা জেনে রেখ।’

কারেৱাস বলল, ‘সিনিয়র আগাসের হাতে কিন্তু অন্ত থাকার সম্ভাবনা। এককালে তার অনেক ম্যাজিকে তাকে আসল রিভলভার ব্যবহার করতে

দেখেছি।’

হাইওয়ে ক্রমে ঢালু নামছে। সানতিয়াগো মোল শ ফুট থেকে এখন আমরা হাজারে নেমে এসেছি। পিছনে দূরে পর্বতশ্রেণী ক্রমে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে আসছে। চলিশ মাইল পথ এসেছি, আরো চলিশ মাইল গেলে ভালপারাইজো। গ্রেনফেলের বেজার মুখ আমার আশাৰ প্রাচীরে বার বার আঘাত কৰে তাকে টলিয়ে দিচ্ছে। হাইওয়েতে কিছু না পেলে শহরে গিয়ে পড়তে হবে। তখন আগাস-এর অনুসন্ধান আরো সহশ্র গুণ বেশি কঠিন হয়ে পড়বে।

রাস্তা সামনে খানিকটা চড়াই উঠে গেছে। পিছনে কী আছে দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। চড়াই পেরোল। সামনে রাস্তা ঢালু নেমে গেছে বহুদূর। রাস্তার পাশে এখানে ওখানে দু-একটা গাছ। বহুদূরে একটা গ্রাম। মাঠে মোমের দল। জনমানবের কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু সামনে ওটা কী? এখনো বেশ দূর। সিকি মাইল তো হবেই।

এখন চারশো গজের বেশি নয়। একটা গাড়ি। রোদে ঝলমল কৰছে। রাস্তার এক পাশে বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে একটা গাছের গুঁড়ি।

এবার কাছে এসে পড়েছে গাড়িটা।
ক্যাডিলাক গাড়ি। সিলভার ক্যাডিলাক।

আমাদের মারসেডিস তার পাশে এসে দাঁড়াল। গাড়িটা কেন থেমে আছে তার কারণটা এবার বুঝলাম। রাস্তার এক পাশে ছিটকে গিয়ে সেটা একটা গাছের গুঁড়িতে মেরেছে থাকা। গাড়ির সামনের অংশ গেছে থেতলে।

কারেৱাস বলল, ‘সিনিয়র আগাসের গাড়ি। এছাড়া আরেকটা সিলভার ক্যাডিলাক আছে সানতিয়াগোতে। ব্যাক্তার সিনিয়র গাল্দামেসের গাড়ি। কিন্তু এটাৰ নম্বৰ আমার চেনা।’

গাড়ি তো রয়েছে, কিন্তু আগাস কোথায়?

আর আমার কৰ্ত্তসই বা কোথায়?

ড্রাইভারের পাশের সীটে ওটা কী?

জানলা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে দেখলাম সেটা কৰ্ত্তসের খাঁচা। দরজার চাবি আমারই তৈরি, আর সেটা রয়েছে আমারই পক্কেটে। আজ দুপুরে দরজায় চাবি দিইনি, শুধু ছিটকিনিটাই লাগানো। কৰ্ত্তস খাঁচা থেকে নিজেই বেরিয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু তারপরে?

হঠাৎ একটা চিংকার কানে এল। দূর থেকে + মানুষের গলা।

কারেৱাস ও অন্য পুলিশটি বন্দুক উচিয়ে তৈরি। আমাদের ড্রাইভার দেখলাম ভীতু লোক। সে মাটিতে হাঁট গেড়ে বসে মেরি মাতার নাম জপ কৰতে শুরু কৰেছে। গ্রেনফেল ফিসফিস্ কৰে বলল, ‘ম্যাজিশিয়ান জাতটা আমাকে বড়

আনকামফাৰটেবল কৰে তোলে।' আমি বললাম, 'তুমি বৰং আমাদেৱ গাড়িৱ
ভিতৰে গিয়ে বোস।'

চিৎকাৰটা আমাদেৱ দিকে এগিয়ে আসছে। রাস্তাৰ বাঁ দিক থেকে। কিছু দূৰে
কতগুলো ঘোপড়া। দু-একটা বড় বড় গাছও রয়েছে। সেই দিক থেকেই আসছে
চিৎকাৰটা। কাল বাতে ফিসফিসে গলা শুনেছি, তাই চিনতে দেৱ হল। এ গলা
আগামী। অকথ্য অশ্রাব্য স্প্যানিশে সে গাল দিয়ে চলেছে। কাৰ উদ্দেশে?
আগামী। অকথ্য অশ্রাব্য স্প্যানিশ প্ৰতিশব্দটা বার কয়েক কানে এল, আৱ তাৰ সঙ্গে
ডেভিল বা শয়তানেৱ স্প্যানিশ প্ৰতিশব্দটা বার কয়েক কানে এল, আৱ তাৰ সঙ্গে
কৰ্ভসেৱ নামটা।

'কোথায় গেল সে শয়তান পাখি? কৰ্ভস! কৰ্ভস! মুৰ্খ পাখি! শয়তান
পাখি! নৱকবাস আছে তোমাৰ কপালে। নৱকবাস!'

আগামীৰ কথা আচমকা থেমে গেল—কাৰণ সে আমাদেৱ দেখতে পেয়েছে।
আমৰাও দেখতে পাছি তাকে। তাৰ দু' হাতে দুটো রিভলভাৱ। একশো হাত
দূৰে একটা ঘোপড়াৰ সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে।

কাৱেৱাস হৃষ্কাৰ দিয়ে উঠল, 'সিনিয়াৰ আগসি, তোমাৰ অস্ত্ৰ নামাও, নইলে—'
একটা কৰ্ণপটহিবিদাৰক শব্দে আমাদেৱ মারসেডিসেৱ দৰজায় একটা
রিভলভাৱেৰ গুলি এসে লাগল। তাৱপৰ আৱো তিনটে গুলিৰ শব্দ। এদিকে
ওদিকে আমাদেৱ মাথাৰ উপৰ দিয়ে ছটকে বেৱিয়ে গেল সেগুলি। কাৱেৱাস দৃশ্য
কঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'সিনিয়াৰ আগসি, আমাদেৱ কাছে বন্দুক রয়েছে। আমৰা
পুলিশ। আপনি যদি রিভলভাৱ না ফেলে দেন, তবে আমৰা আপনাকে জখম
কৰতে বাধা হব।'

'জখম?' আগসি শুকনো গলায় আৰ্তনাদ কৰে উঠল। 'তোমৰা পুলিশ?
আমি যে কিছুই দেখতে পাছি না!'

আগসি এখন পঁচিশ হাতেৰ মধ্যে। এইবাৱ বুঝলাম তাৰ দশাটা। তাৰ
চশমাটি খোওয়া যাওয়াতে সে প্ৰায় অক্ষেৱ সামিল হয়ে পড়ে যত্রত্র গুলি
চালিয়েছে।

আগসি হাতেৰ অস্ত্ৰ ফেলে দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে এলো। কাৱেৱাস
ও অন্য পুলিশটি তাৰ দিকে এগিয়ে গেল। আমি জানি এ সংকটে আগামীৰ
কোনো ভেলকিই কাজ কৰবে না। তাৰ অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কাৱেৱাস
এগিয়ে গিয়ে মাটি থেকে রিভলভাৱ দুটো তুলে নিল। আগসি তখন বলছে, 'সে
পাখি উধাও হয়ে গেল! দ্যাট ইনডিয়ান ক্রো! শয়তান পাখি...কিন্তু কী অসামান্য
তাৰ বুদ্ধি!'

গ্ৰেনফেল কিছুক্ষণ থেকে ফিসফিস কৰে কী যেন বলতে চেষ্টা কৰছিল, এবাৱে
তাৰ কথাটা বুঝতে পাৱলাম।

'শঙ্কু—দ্যাট বাৰ্ড ইজ হিয়াৰ।'

কী রকম? কোথায় কৰ্ভস? আমি তো দেখছি না তাকে!

গ্ৰেনফেল রাস্তাৰ উটোদিকে নেড়া অ্যাকেসিয়া গাছটাৰ মাথাৰ দিকে আঙুল
দেখাল।

উপৰে চেয়ে দেখলাম—সত্যিই তো—আমাৰ বঞ্চু, আমাৰ শিয়া, আমাৰ প্ৰিয়
কৰ্ভস গাছটাৰ সবচেয়ে উঁচু দালে বসে নিশ্চিন্তভাৱে আমাদেৱ দিকে ঘাড় নিচু
কৰে দেখছে।

তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতেই সে অক্ষেশে গৌত খাওয়া ঘৃড়িৰ মতো গাছেৰ
মাথা থেকে নেমে এসে বসল আমাদেৱ মারসেডিসেৱ ছাদেৱ উপৰ। তাৱপৰ
অতি সন্তৰ্পণে—যেন জিনিসটাৰ মূল্য সে ভালোভাৱেই জানে—তাৰ ঠাঁট থেকে
তাৰ সামনেই নামিয়ে রাখল আগামীৰ মাইনাস বিশ পাওয়াৱেৱ সোনাৰ চশমাটা।